৭.১০ দস্যু বনহুর ও দস্যুরাণী – Bangla Library

৭.১০ দস্যু বনহুর ও দস্যুরাণী – Bangla Library

দস্যু বনহুর ও দস্যুরাণী–১১০

বাইনোকুলার হাতে জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে আছে দস্যুরাণী।

পাশে দন্ডায়মান দস্যু বনহুর।

তার শরীরে পূর্বের পোশাক নেই। নতুন ঝকঝকে কোট প্যান্ট টাই এবং পায়ে ভারী বুট।

সিগারেট পান করছিলো বনহুর আপন মনে।

দৃষ্টি তার সম্মুখে সীমাহীন জলরাশির দিকে। একরাশ ধূয়ো কুন্ডলী পাকিয়ে ঘুর পাক খাচ্ছিলো তার চারপাশে।

বনহুরকে অদ্ভুত সুন্দর লাগছিলো আজ।

দস্যুরাণী একবার আড় নয়নে বনহুরের দিকে তাকিয়ে দেখে নিলো। লোক মুখে সে শুনেছিলো তারপর নিজেও সে ইতিপূর্বে কয়েকবার দেখেছিলো কিন্তু আজ যেমন করে বনহুরকে একেবারে নিকটে অতি নিপুণ ভাবে দেখবার সুযোগ পেয়েছে এমনভাবে আর কখনও পায়নি। সত্যই বনহুর পৌরুষদীপ্ত এক পুরুষ।

দস্যুরাণী কিছু ভাবছিলো।

একটা মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠে দস্যুরাণীর ঠোঁটের কোণে। বাইনোকুলার চোখে লাগিয়ে নিজকে সামলে নিলো রাণী, তারপর বললো–আমার মনে হয় আমরা ঠিক জায়গার কাছাকাছি পৌঁছে গেছি।

বনহুর এবার ফিরে তাকালো দস্যুরাণীর মুখের দিকে। বললো সে–ম্যাপখানা একবার দেখতে হবে।

দস্যুরাণী নিজ প্যান্টের পকেট থেকে একটি ভাঁজ করা কাগজ বের করে মেলে ধরলো জাহাজের ডেকে ছোট্ট টেবিলটার উপরে।

বনহুর হাতের অর্ধদগ্ধ সিগারেটখানা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ঝুঁকে পড়লো ম্যাপখানার উপরে।

কিছুক্ষণ গভীর মনোযোগ সহকারে ম্যাপখানা লক্ষ্য করে বললো বনহুর–এ ম্যাপখানা তুমি কোথা থেকে আবিষ্কার করেছে রাণী।

সে কাহিনী একদিন তোমাকে বলবো, কাজ উদ্ধার হবার পর। কথাগুলো বলে দস্যুরাণীও ঝুঁকে পড়লো ম্যাপখানার উপরে।

বনহুর ম্যাপের দিকে দৃষ্টি রেখে বললো–ম্যাপখানা নিয়েই আমাকে কাজ করতে হবে, কাজেই সব জানতে হবে।

দস্যুরাণী বললো–এ ম্যাপখানা ক্যাপ্টেন লরেন তৈরি করে ছিলো। আজ ক্যাপ্টেন লরেন আমাদের মধ্যে নেই, থাকলে কাজটা আরও অনেক সহজ হতো।

ক্যাপ্টেন লরেন! একটু বিস্ময় নিয়ে নামটা উচ্চারণ করলো বনহুর।

বললো দস্যুরাণী–হাঁ ক্যাপ্টেন লরেন।

ওর নাম আমি শুনেছি–বড় দুঃসাহসী ছিলো সে।

সে কথা মিথ্যো নয়। ক্যাপ্টেন লরেনের দুঃসাহসিকতার প্রমাণ এই ম্যাপখানা। জাহাজ লং যখন নীলনদে ডুবে যায় তখন ক্যাপ্টেন লরেন এ ম্যাপখানা এঁকেছিলো এবং তা অতিকৌশলে আমার হস্তগত করেছিলো সে নিজের জীবন উৎসর্গ করে।

ঘটনাটা জানাতে হয় রাণীজী। এতে তোমার জিনিস উদ্ধারের কাজ কিছু সহজ হতে পারে।

বেশ আমি যা জানি তোমাকে সংক্ষেপে বলছি। তবে তোমাকে বিশ্বাস করি বলেই বলছি বনহুর।

বলো রাণী?

বনহুর টেবিলটির এক কোণে ঠেস দিয়ে বসলো। দৃষ্টি তার সম্মুখে দন্ডায়মান দস্যুরাণীর মুখে।

বললো দস্যুরাণী–বনহুর, তুমি রক্তে আঁকা ম্যাপখানা পাবার জন্য একদিন উন্মুখ ছিলে

আজও আছি। বলে একটু হাসলো বনহুর। তারপর বললো–রক্তে আঁকা ম্যাপখানা আমাকে দিলে তোমার তেমন কোনো ক্ষতি সাধন হবে না রাণী। তা ছাড়া আমাদের উদ্দেশ্য যখন এক তখন রক্তে আঁকা ম্যাপখানা আমাকে না দেবার কোনো কারণ নেই তোমার? জানো রাণী মন্থনা দ্বীপের যা অবস্থা তা বর্ণনা করা যায় না। অনেকদিন দূরে ছিলাম, জানিনা এখন সেখানে কি পরিস্থিতি ঘটেছে। আমি চাই রক্তে আঁকা ম্যাপ নিয়ে সন্ধান চালাতে এবং ঐ ধন–রত্ন মন্থনা বাসীদের জীবন রক্ষার্থে কাজে আসবে।

তোমার প্রস্তাবে আমি সম্মত বনহু। মন্থনা দ্বীপের উপর আমারও সহানুভূতি আছে। যাক এবার শোন বনহুর, ক্যাপ্টেন লরেনের জীবন কাহিনী একটি সংক্ষিপ্ত অধ্যায়।

বেশ বলো!

ক্যাপ্টেন লরেনের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে এক হোটেলে। তার সঙ্গে একই টেবিলে বসে আমরা কপি পান করছিলাম। কি জানি কেনো যেন ক্যাপ্টেন লরেনকে আমার ভাল লাগলো, মনে হলো আমার বাবা বেঁচে থাকলে আজ এই বয়সের হতেন। কফি পান করতে করতে অনেক কথা হলো তার সঙ্গে। জানতে পারলাম জাহাজ লংলুর ক্যাপ্টেন তিনি, নাম লরেন। কথাবার্তা জড়িত তবে বেশ বোঝা যায়। তার মুখেই জানতে পারলাম যে কোনো এক অজানা দ্বীপের সন্ধানে চলেছে লংকে নিয়ে। তার জাহাজ এখন নীলনদে ফিরুসা বন্দরে অপেক্ষা করছে। সে কোনো কারণে

একজন সঙ্গী নিয়ে আকাশ পথে এসেছিলো হিমাদ্রীনগরে। আজই তারা ফিরে যাবে ফিরু বন্দরে। ঐ মুহূর্তে লরেন অপেক্ষা করছিলো তার সঙ্গীর জন্য। সঙ্গী ফিরে এলেই তারা রওয়ানা দেবে।

একটু থামলো দস্যুরাণী। দৃষ্টি তার সমুদ্রের জলরাশির দিকে।

বনহুর সিগারেট কেসটি বের করে নতুন একটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে নিলো। তারপর একমুখ ধোয়া ছুঁড়ে দিয়ে আপন মনে বললো–লংলু।

হাঁ, সেই লংলু জাহাজ নিয়ে ক্যাপ্টেন লরেন রওয়ানা দিলো। এবার সে আমাকে তার সঙ্গে যাওয়ার জন্য অনুরোধ জানালো। কারণ আমার কথাবার্তায় লরেন মুগ্ধ হয়েছিলো, সে আমাকে নিজ কন্যার মত মনে করেই এ ইচ্ছা প্রকাশ করলো। আমি এক কথায় রাজি হয়ে গেলাম কারণ আমার বুঝতে বাকি রইলো না ক্যাপ্টেন লরেন এমন কোনো স্থানে যাত্রা করছে যেখানে নতুন কোনো রহস্য লুকিয়ে আছে।

বললো বনহুর–তুমি ঠিকই চিন্তা করেছিলে রাণী। ক্যাপ্টেন লরেন এমন কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে অজানা দ্বীপের সন্ধানে চলেছিলো যার পেছনে রয়েছিলো কোনো গোপন রহস্য।

হাঁ, সে কারণেই আমি ক্যাপ্টেন লরেনের সঙ্গে যাত্রা করলাম। কিন্তু লরেনের সঙ্গীটিকে আমার মোটেই পছন্দ হলোনা। তার চাল–চলন কথাবার্তা আমাকে কেমন যেন সন্দিহান করে তুললো। আমি বুঝতে পারলাম ক্যাপ্টেন লরেনের সঙ্গে লোকটা আমাকে অন্তর থেকে গ্রহণ করছে না। তবু আমি বিচলিত হলাম না, বা ঘাবড়ে গেলাম না। আমি ক্যাপ্টেন লরেনের ক্যাবিনের পাশের ক্যাবিনেই রইলাম। উদ্দেশ্য সব সময় ক্যাপ্টেন লরেনের সঙ্গ লাভ। পিতৃ স্নেহে ক্যাপ্টেন লরেন আমাকে দেখতে লাগলেন এবং সব কথা একদিন আমাকে বলরেন। ক্রমেই আমার কাছে গোপন রহস্য উদঘাটন হয়ে গেলো। ক্যাপ্টেন লরেন বললেন একদিন তারা যে দ্বীপের সন্ধানে চলেছে ঐ দ্বীপের নাম হিরোমা দ্বীপ। এ দ্বীপের ছিলো এক জংলী সর্দার, সে কোনো এক সময় একটি বিরাট তিমি গর্ভ থেকে একটি অতি মূল্যবান পাথর পেয়েছিলো। পাথরটির ওজন প্রায় এক পাউন্ড ছিলো এবং সেই পাথরটি সাধারণ পাথর বা বস্তু নয়। সেটা পরীক্ষা করে জানা যায় সেটি একটি হীরক খন্ড এবং সেটার নাম মাণিক।

বনহুর একটা শব্দ করলো–হুঁ! তারপর?

দীর্ঘ এক সপ্তাহ পর জাহাজ লং হিরোমা দ্বীপে পৌঁছে গেলো। আমি আশ্চর্য হলাম লংলু হিরোমা দ্বীপে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে জংলী সর্দার দলবলসহ ক্যাপ্টেন লরেনকে অভ্যর্থনা জানালো। আমি জানতে পারলাম ইতিপূর্বে ক্যাপ্টেন লরেন তার জাহাজ লংলু নিয়ে এ দ্বীপে এসেছিলো এবং হিরোমার জংলী সর্দারের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলো। তখন ক্যাপ্টেন লরেনকে জংলী সর্দার ঐ পাথর অথবা হীরকটি দেখিয়েছিলো। ক্যাপ্টেন লরেন বুঝতে পেরেছিলেনস এ পাথর সাধারণ নয় মাণিক ওটা। জংলী সর্দারের কাছে ওটা মূল্যহীন কারণ কোনো লোকালয়ের বা সভ্য সমাজের সঙ্গে হিরোমা দ্বীপের যোগাযোগ ছিলো না। হিরোমর সর্দার চাইতোনা কোনো সভ্য সমাজের লোকজন তার দ্বীপে যায়। ক্যাপ্টেন লরেনকে জংলী সর্দার সহজে মেনে নিয়েছিলো না। প্রথমে নাকি ভীষণভাবে জংলী সর্দার ক্যাপ্টেন লরেন ও তার সঙ্গীদের উপর আক্রমণ চালিয়ে ছিলো। দস্যুরাণী একটু থামলো।

বনহুর মনোযাগ সহকারে শুনছে দস্যুরাণীর কথাগুলো। কারণ তাকে জানতে হবে সমস্ত ঘটনাটা। বললো বনহুর–তারপর?

দস্যুরাণী বললো–তারপর ক্যাপ্টেন লরেন তার দলবলসহ বন্দী হলো জংলী সর্দারের হাতে। বন্দী হবার পর ক্যাপ্টেন লরেন জংলী সর্দারকে নানা ভাবে

বোঝাতে চেষ্টা করলে তারা শত্রু নয়, বন্ধুত্ব করতে চায়। এরপর ক্যাপ্টেন লরেন এক বুদ্ধি এটেছিলো, তার জাহাজে ছিলো অনেক নেশাযুক্ত সারাব। কয়েক বোতল বিদেশী সরাব প্রদান করলো সে জংলী সর্দারকে। সর্দার ঐ সরাব পান করে আনন্দে উচ্ছল হলো। সেই মুহূর্তে সে মুক্তি দিলো ক্যাপ্টেন লরেন ও তার দলবলকে এবং হাতে হাত মিলালো। জাহাজে যত বোতল সরাব ছিলো সব ক্যাপ্টেন লরেন জংলী সর্দারকে দিলো। এরপর জংলী সর্দার আর ক্যাপ্টেন লরেনের মধ্যে বন্ধুত্ব আরও গম্ভীর হয়ে উঠলো। জংলী সর্দার একদিন তার সেই মহামূল্যবান পাথরটি দেখালো ক্যাপ্টেন লরেনকে এবং এ বস্তুটি পাওয়ার ব্যাপারে ঘটনাটা বোঝালো– কেমন করে ওটা তারা বিরাট তিমি মাছের উদর হতে পেয়েছে। দস্যুরাণী এবার প্যান্টের পকেট থেকে রুমালখানা বের করে মুখ মুছে নিলো।

বনহুর তার হাতের আংগুলে আগুনের আঁচ অনুভব করায় চমকে উঠলো, কারণ সে গভীর মনোযোগ সহকারে শুনছিলো দস্যুরাণীর কথাগুলো। সিগারেটটা এক সময় নিঃশেষ হয়ে আংগুলে এসে ঠেকেছে সেদিকে খেয়াল নেই তার।

অবশ্য রাণী সংক্ষেপেই বলে যাচ্ছিলো ঘটনাটা।

রাণী বলতে শুরু করলো আবার।

বনহুর তার আংগুল থেকে সিগারেটের শেষ অংশটা নিক্ষেপ করে নতুন একটা সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করলো। দুটি তার বাঁকা হয়ে উঠেছে। চোখে তীক্ষ্ণদৃষ্টি, একভাবে বনহুর তাকিয়ে আছে রাণীর মুখের দিকে।

বলছে দস্যুরাণী–ক্যাপ্টেন লরেন বুঝলেন একমাত্র সরাবের বিনিময়েই ঐ মূল্যবান বস্তুটিকে সে পেতে পারে। আরও বুঝতে পারলেন ঐ মহামূল্যবান বস্তুটির কোন দামই নেই তাদের কাছে। কারণ ওরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ, ওদের খাদ্য অর্দ্ধ দগ্ধ মাংস, বিভিন্ন গাছের ফল এবং রস। পশুর চামড়া ওরা ব্যবহার করে। মূল্যবান বস্তুটি তারা প্রচুর সরাবের বিনিময়ে দিয়ে দিল ক্যাপ্টেন লরেনকে। প্রথম যাত্রায় বস্তুটি দেখে এসেছিলো ক্যাপ্টেন লরেন, দ্বিতীয় যাত্রায় সেটা সে কৌশলে গ্রহণ করলো। দ্বিতীয় যাত্রায় আমি তার সঙ্গে ছিলাম, কাজেই আমার সম্মুখেই সেই মহামূল্যবান বস্তুটি ক্যাপ্টেন লরেনের হাতে প্রদান করলো জংলী সর্দার বিনা

দ্বিধায়। একটু থেমে পুনরায় বললো রাণী–এরকম পাথর আমি আমার জীবনে প্রথম দেখলাম যা থেকে বিচ্ছুরিত আলোর ঝিলিক চোখে ধা ধা লাগিয়ে দেয়।

বনহুর সিগারেট থেকে ছাই ঝেড়ে ফেলে নিয়ে একটু সোজা হয়ে বসে বললো–তারপর?

ক্যাপ্টেন লরেন–এর মূল উদ্দেশ্য ঐ মূল্যবান বস্তুটি হস্তগত করা। ওটা যখন হাতে পেয়ে গেলো তখন ক্যাপ্টেন লরেন দেশে ফিরে আসার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লো। আমি নিজেও ফিরে আসার জন্য উদগ্রীব হলাম। কারণ আমার অনেক কাজ জমা হয়েছিলো। ক্যাপ্টেন লরেন একদিন জংলী সর্দারের কাছে বিদায় নিয়ে স্বদেশের পথে রওয়ানা দিলো। জাহাজ লংলু যখন হিরোমা দ্বীপ ত্যাগ করলো তখন অগণিত জংলী এসে ভীড় জমালো বিদায় জানাতে। আমি খুশি হলাম ওদের আচরণে তেমনি দুঃখও পেলাম, কারণ যে বস্তু আমরা তাদের কাছ থেকে নিয়ে চললাম তা সাতরাজার সম্পদ। একটি কথা বলতে ভুলেই গেছি প্রায়, ক্যাপ্টেন লরেনের সঙ্গে যে একজন ছিলো তার নাম হ্যারিসন। আমি লক্ষ্য করেছি প্রথম থেকেই কেমন যেন সন্দেহপূর্ণ ভাব নিয়ে চলছিলো লোকটা।

বনহুর বললো–তুমি এ ব্যাপারে ক্যাপ্টেন লরেনকে কিছু ইংগিত দাওনি?

না, কারণ আমি নিজেই সব নিপুণভাবে লক্ষ্য করছিলাম। সত্যই সে ক্যাপ্টেন লরেনের শুভাকাঙ্ক্ষী কি না জানা দরকার। জানলাম একদিন এবং সেই দিনই জানালাম ক্যাপ্টেন লরেনকে সব কথা। কিন্তু আশ্চর্য এতে ক্যাপ্টেন লরেন কিছুমাত্র বিচলিত হলেন না। তার মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত না হওয়ায় আমি মনে মনে ক্রুদ্ধ হলাম। ক্যাপ্টেন লরেন কিন্তু বুঝতে পারলো আমি তার সঙ্গীর আচরণে সন্তুষ্ট নই। এক সময় ক্যাপ্টেন লরেন আমাকে নিভতে ডেকে বললো–মিস এলি তুমি জানোনা শত্রুর সঙ্গে বেশি করে বন্ধুত্ব করতে হয় যেন সে কোন ক্ষতি সাধন করতে উৎসাহ না পায়। মাণিকটিকে সে কোথায় রেখেছে ঐ দিনই আমাকে বলে এবং দেখায়। জাহাজ লালুর তলদেশে কোনো এক গোপন স্থানে ঐ মাণিকটি যত্নসহকারে রেখে দিয়েছিলো সে। আমি আর ক্যাপ্টেন লরেন শুধু জানলাম কোথায় আছে সেই বস্তুটি। এরপর ক্যাপ্টেন লরেনের সঙ্গে তার সঙ্গী প্রকাশ্য বিবাদ শুরু করলো। যদিও জাহাজ লংলুতে প্রায় বিশ থেকে পঁচিশ জন লোক ছিলো তারা সবাই ক্যাপ্টেন লরেনের অনুগত ছিলো এবং তারা তাকে ভালও বাসতো। কয়েক দিনে আমি সব জেনে নিলাম। তারপর একদিন গভীর রাতে আমি শুনতে পেলাম ক্যাপ্টেন লরেনের সঙ্গে তর্কবিতর্ক হচ্ছে তার

সঙ্গীটির। আমি রাতে ঘুমাতে পারতাম না, কারণ আমার সন্দেহ হতো ক্যাপ্টেন লরেনকে যে কোন মুহূর্তে তার সঙ্গী হত্যা করতে পারে।

বনহুর বললো–তা হলে তোমার সবদিকে খেয়াল ছিলো?

একটু হেসে বললো দস্যুরাণী জাহাজে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই আমি জাহাজের সবকিছু লক্ষ্য করছিলাম এবং সে কারণেই ক্যাপ্টেন লরেন সে যাত্রা বেঁচে গিয়েছিলো। তার সঙ্গী তাকে হত্যা করার সুযোগ পায়নি। সে যাত্রা মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা পেলেও জাহাজ লংলুকে রক্ষা করতে পারলো না ক্যাপ্টেন লরেন। মহামূল্যবান বস্তুটির সন্ধান না পেয়ে সে পাগলের ন্যায় হয়ে উঠলো এবং সে কারণেই ক্যাপ্টেন লরেনকে সে প্রকাশ্য আক্রমণ করলো। পাশের কক্ষ থেকে আমি সব শুনলাম।

তারপর?

সেইদিন ভোর রাতে ক্যাপ্টেন লরেন এর সঙ্গী শয়তানটা জাহাজের ইঞ্জিনে আগুন ধরিয়ে দিলো। আগুন যখন জাহাজের বয়লারে প্রবেশ করে তখন আমরা জানতে পারলাম। ভীষণ শব্দে আমাদের ঘুম ভেঙে গেলো। বয়লার বাষ্ট করেছে। মুহূর্তে আমরা জাহাজের ডেকে এসে দাঁড়ালাম। জাহাজের তলদেশে খোলের যে অংশে ক্যাপ্টেন সেই মূল্যবান সম্পদটি লুকিয়ে রেখেছিলো সেখানে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। ক্যাপ্টেন লরেন আমাকে দেখে উম্মাদের মতো চিৎকার করে নিজের মাথার চুল টেনে ধরলো, বললো–সর্বনাশ আমার সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেলো...ছুটে যাচ্ছিলো ক্যাপ্টেন লরেন অগ্নিকুন্ডের দিকে। হয়তো উন্মাদের মত ঝাঁপিয়ে পড়বে সে, আমি ধরে ফেললাম। কিছু বোঝাতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু কোনো কথাই শুনলো না ক্যাপ্টেন লরেন, আমাকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়ে চলে গেলো সেই ভয়ংকর দাউ দাউ করা অগ্নি রাশির দিকে। আমিও পিছু পিছু দৌড়ালাম। একটু থেমে দস্যুরাণী কিছু ভাবলো, হয়তো সেদিনের স্মৃতি স্মরণ হওয়ায় একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা অনুভব করলো সে, নিজকে সংযত করে নিয়ে বলতে শুরু করলো আবার দস্যুরাণী– আমি সেই মুহূর্তে ক্যাপ্টেন লরেনকে ধরে রাখতে পারলাম না কিছুতেই। সে দাউ দাউ করা অগ্নি কুন্ডের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লো, তারপর যখন ক্যাপ্টেন লরেন আবার ফিরে এলো তখন তাকে চিনবার উপায় ছিলো না। সে কি ভয়ংকর দৃশ্য যা ভাবলে আজও আমি শিউরে উঠি। এদিকে জাহাজ ধীরে ধীরে তলিয়ে যাচ্ছে, চারদিকে আগুন জ্বলছে। জাহাজের সারেঙ্গ থেকে খালাসী পর্যন্ত বিভ্রান্তের মত ছুটোছুটি করছে। উন্মাদের মত তাদের

চেহারা, এমন কি যে ব্যক্তি জাহাজের ইঞ্জিনে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলো তাকেও দেখলাম তার মৃত্যুর মুহূর্তে সেকি করুণ আর ফ্যাকাশে তার চেহারা। সবাই নিজ নিজ প্রাণ রক্ষার্থে পাগলের মতো ছুটোছুটি করছে। ক্যাপ্টেন লরেন আমার সম্মুখে এসে দাঁড়ালো, একটা অগ্নিদগ্ধ মাংস পিন্ডের মত তাকে দেখাচ্ছে। সে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে জড়িত কণ্ঠে বললো–কাগজ আর একটা পেনসিল আমাকে দাও...আমি দ্রুত আমার ক্যাবিনে গেলাম এবং একটা পেনসিল আর কিছুটা কাগজ নিয়ে ফিরে এলাম ক্যাপ্টেন লরেনের পাশে। ক্যাপ্টেন লরেন তখন ডেকের উপর উঁচু হয়ে পড়ে গেছে। সমস্ত দেহটা তার থর থর করে কাঁপছে। আমি তাড়াতাড়ি কাগজ আর পেনসিলটা তার হাতে খুঁজে দিলাম। ক্যাপ্টেন লরেনের একটা চোখ একদম গলে নষ্ট হয়ে গেছে। একটি চোখ দিয়ে তখনও সে একটু দেখতে পাচ্ছিলো বলে মনে হলো। সে এবার পেনসিলটা ধরলো তারপর এঁকে গেলো। একটা ম্যাপ, যে ম্যাপখানা আমার সম্মুখে এখন মেলানো অবস্থায় দেখতে পাচ্ছে বলে দস্যুরাণী সোজা হয়ে দাঁড়ালো।

বনহুর ম্যাপখানায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বললো–এই ম্যাপখানা তা হলে ক্যাপ্টেন লরেনের...

বনহুরের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললো দস্যুরাণী–হাঁ বনহুর, ক্যাপ্টেন লরেন এই ম্যাপখানা তার মৃত্যুর কয়েক মিনিট পূর্বে এঁকেছিলো। ম্যাপখানার একটি জায়গায় আংগুল দিয়ে দেখিয়ে বললো দস্যুরাণী–ক্যাপ্টেন ঠিক এই জায়গায় আংগুল রেখে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলো।

বনহুর বললো–ক্যাপ্টেন লরেন তখন যে অবস্থায় ছিলো তাতে সে কি ঠিক মত ম্যাপ তৈরি করতে পেরেছে?

হাঁ আমার বিশ্বাস একটুও ভুল হয়নি। ঐ দেখো বনহুর নীল নদের যে জায়গায় জাহাজ লংলু ডুবে গিয়েছিলো সেখান থেকে কিছুদূর রয়েছে একটি ঘূর্ণীয়মান জলস্রোত। ক্যাপ্টেন লরেন গভীর রাতেই অগ্নিশিখার আলোতে সমুদ্র গর্ভ লক্ষ্য করছিলো আমি স্পষ্ট দেখেছি। এই দেখো ম্যাপখানার এই যে এখানে সমুদ্র জলতরঙ্গ কেমন ঘূর্ণীয়মান মনে হচ্ছে।

বনহুর বাইনোকুলার চোখে লাগিয়ে ভালভাবে লক্ষ্য করতে লাগলো, দূরে সমুদ্র বক্ষে জলরাশির মধ্যে কিছুটা জলতরঙ্গ ঘূর্ণির মত ঘুরপাক খাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। বনহুর আনন্দভরে বলে উঠলো–হা রাণী, আমার ঠিক নজরে পড়ছে

কিছুদূর সমুদ্র বক্ষে জলরাশি ঘূর্ণীয়মানভাবে তরঙ্গায়িত হচ্ছে। জাহাজখানাকে এখানেই নোঙ্গর করতে বলো....

বনহুরের কথা শেষ না হতেই জাহাজের হেড খালাসী দৌড়ে এসে জানালো–রাণীজী–রাণীজী আমাদের সার্চ মেশিনে ধরা পড়েছে সমুদ্রের এ স্থানের কোথাও জাহাজ লংলুর বিদগ্ধ অংশ রয়েছে।

হাঁ আমার সম্মুখস্থ ম্যাপখানাও তাই বলছে। কথাটা বললো দস্যুরাণী। তারপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললো–বলরাম সিং চন্দনা কোথায়?

খালাসী বলরাম বললো–রাণীজী চন্দনা দিপালীর ক্যাবিনে রয়েছে।

তাকে পাঠাও।

আচ্ছা! বলে কুর্ণিশ জানিয়ে চলে গেলো বলরাম। বলরাম দস্যুরাণীর একজন বিশ্বস্ত অনুচর হলেও সে দস্যুরাণীর নিজস্ব জাহাজ রাণীর খালাসী হিসেবেই কাজ করে। দস্যুরাণী বিশ পঁচিশ জন অনুচরকে তার জাহাজ রাণীর কাজে নিয়োজিত রেখে ছিলো। জাহাজ রাণীর অভ্যন্তরে ছিলো নানা ধরনের যন্ত্র এবং মেশিনাদি। এমন মেশিনও আছে যা দিয়ে স্পষ্ট দেখা যায় সমুদ্রের গভীর তলদেশে কোথায় কি আছে। জাহাজ রাণীর সারেঙ্গ হুদ সর্বক্ষণ এ সব মেশিনের দিকে লক্ষ্য রেখে কাজ করে যাচ্ছে।

সারেঙ্গ হুদের সতর্কতার জন্য দস্যুরাণী খুশি হলো। কারণ হু ভাল ভাবে সার্চ মেশিনে দৃষ্টি রেখে কাজ করছিলো।

বনহুর আর দস্যুরাণী বাইনোকুলারে দৃষ্টি রেখে সতর্কতার সঙ্গে দেখতে লাগলো। সমুদ্র গর্ভে কি ভাবে ঘূর্ণীয়মান জলতরঙ্গ প্রচন্ড তোলপাড় করছে।

বনহুর আর রাণী যখন এ স্থানটি মনোযোগ সহকারে দেখছিলো তখন চন্দনা এসো কুর্ণিশ জানালো বিশেষ এক ভঙ্গিমায়।

দস্যুরাণী বললো–যাও চন্দনা, জাহাজ নোঙ্গর করতে বলে। আর শোনো দিপালী, যেন তার ক্যাবিন থেকে বেরিয়ে আসতে না পারে।

হাঁ সে ব্যবস্থা আমি করেছি। কথাটা বলে চন্দনা কুর্ণিশ জানালো তারপর চলে গেলো সে।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই জাহাজ রাণী থেমে পড়লো।

এবার দস্যুরাণীর নির্দেশে একটি বিরাট মেশিন অদ্ভুত সরঞ্জামসহ নিয়ে আসা হলো সেখানে। আরও এলো কয়েকজন অনুচর তাদের শরীরেও অদ্ভুত পোশাক পরা ছিলো।

বনহুর তাকিয়ে দেখলো লোকগুলোকে।

দুচোখে তার বিস্ময় ফুটে উঠলো।

দস্যুরাণী লক্ষ্য করে বললো–বনহুর, ওরা তোমাকে সাহায্য করবে। এরা সবাই দক্ষ ডুবুরী। একটু থেমে বললোবনহুর, আমার বিশ্বাস তুমি জয়যুক্ত হবে।

বনহুর কোন জবাব দিলো না।

দস্যুরাণী একজনের হাত থেকে একটি প্যাকেট নিয়ে বললো–এই নাও এটা তুমি পরে নাও বনহুর।

বনহুর হাত বাড়িয়ে প্যাকেটটি নিলো।

দস্যুরাণী আংগুল দিয়ে দেখিয়ে দিল ওদিকের একটি ক্যাবিন– যাও পরে এসো।

বনহুর নীরবে প্রস্থান করলো।

ক্যাবিনটার মধ্যে প্রবেশ করে দেখলো চারদিকের দেয়ালে নানা ধরনের ডুবুরী পোশাক এবং অক্সিজেন ভরা মুখোস।

বনহুর আরও দেখলো সম্মুখে একটি বিরাট আয়না। বনহুর নিজ পোশাক খুলে ফেললো তারপর পরে নিলো দস্যুরাণীর দেওয়া ডুবুরীর ড্রেস। এ পোশাকটি সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের। এ পোশাকের সঙ্গে রয়েছে সার্চ লাইট, ঠিক্ কপালের উপরে ভালভাবে আটকানো আছে। পিঠের উপরে রয়েছে অক্সিজেন ব্যাগ।

দুপাশের কাঁধে আটকানো রয়েছে ক্যামেরা, মুখের সঙ্গে লাগানো রয়েছে সাউন্ড বক্স যন্ত্র। বনহুর পোশাক পরে নিয়ে বেরিয়ে এলো।

দস্যুরাণী তখন মনোযোগ সহকারে একটা মেশিন পরীক্ষা করছিলো তার অনুচরদের সঙ্গে।

বনহুর এসে দাঁড়াতেই দস্যুরাণী কাজ শেষ করে নেমে এলো মেশিনটার উপর থেকে। তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলো বনহুরের পা থেকে মাথা পর্যন্ত।

এ ড্রেসে বনহুরকে আরও সুন্দর লাগছে।

মুখের আবরণ খোলা, তাই বনহুরের মুখমন্ডল স্পষ্ট নজরে পড়ছিলো।

দস্যুরাণী বললো–বনহুর এ বিপদজনক কাজে তোমাকে না পাঠিয়ে আমি নিজেও পারতাম, কিন্তু তোমার দৈহিক শক্তির কাছে আমি কিছুটা দুর্বল। যদি বুদ্ধি দ্বারা এ কাজ সমাধা করা সম্ভব হতো তা হলে তোমাকে আমি এ ভয়ংকর কাজে নিয়োগ করতাম না। বনহুর, আমার দুঃখ হচ্ছে যদি তুমি সফলকাম না হও এবং কোনো বিপদ তোমার হয়....

রাণী তোমার মুখে এ কথা বড় বেমানান, কারণ আমি জানতাম তুমি নারী হলেও তোমার মনোবল আমার চেয়ে কম নয়। একটু হেসে বললো আবার–বিপদকে আমি ভয় পাই না, বিপদকে জয় করাই আমার কাজ।

বেশ, তা হলে তুমি সমুদ্রগর্ভে নামার জন্য প্রস্তুত হয়ে নাও। মেশিনের সঙ্গে সংযোগ করা একটি পাইপ বনহুরের পিঠে অক্সিজেন ব্যাগটার সঙ্গে ফিট করে দিতে গেলো।

বনহুর বললো–আর একবার ম্যাপখানা আমি দেখতে চাই রাণী।

নিশ্চয়ই।

দস্যুরাণী ম্যাপখানা পুনরায় সম্মুখস্থ টেবিলে মেলে ধরলো।

বনহুর ঝুঁকে দেখে নিলো মনোযোগ সহকারে।

তারপর ডুবুরীবেশে বনহুর এসে দাঁড়ালো জাহাজের ডেকে, পাশেই ছোট্ট একটি সিঁড়ি–ঐ সিঁড়ি পথ নেমে গেছে জাহাজের খোলসের তলদেশে এবং সেই পথে নামতে হবে সমুদ্রগর্ভে বনহুরকে।

বিধ্বস্ত জাহাজ লংলুর তলদেশ কোনো এক চোরা কুঠরীর মধ্যে ছিলো সেই মহামূল্যবান সম্পদটি। সেই মহামূল্যবান সম্পদটি খুঁজে বের করতে হবে দস্যু বনহুরকে। বিধ্বস্ত লংলুর অভ্যন্তরে কোনো ভগ্নস্তুপের মধ্যে রয়েছে সেটা। বনহুরকে দস্যুরাণী ভালভাবে সব বুঝিয়ে দিয়েছে। তার সঙ্গে থাকবে দস্যুরাণীর কয়েক জন ডুবুরী অনুচর। তারা বনহুরকে সাহায্য করবে।

দস্যুরাণী বনহুরের হাতে একটি মিটার ধরনের যন্ত্র দিয়ে বললো–এটা তোমার হাতে বেঁধে নাও। এ যন্ত্রে ধরা পড়ে যাবে কোথায় রয়েছে সেই বস্তুটি।

যন্ত্রটি দেখতে কিছুটা হাত ঘড়ির মত। সঙ্গে বেল্ট বাঁধা রয়েছে। যে বেল্ট দ্বারা যন্ত্রটি হাতের কজায় আটকানো সম্ভব হবে।

বনহুর যন্ত্রটিকে হাতের কজায় বেঁধে নিলো, তারপর যেমনি সে ডেকের সিঁড়ি পথে নামতে যাবে অমনি ছুটে এলো দিপালী–না, আমি তোমাকে সমুদ্রগর্ভে নামতে দেবো না রাজকুমার। আমি তোমাকে নামতে দেবো নাঃ....দিপালী এঁটে ধরলো বনহুরের হাত দুখানা।

দস্যুরাণীর দুচোখে বিস্ময় ফুটে উঠলো।

পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে চন্দনা, তার মুখমন্ডল কিছুটা কিংকর্তব্যবিমূঢ় দেখাচ্ছে।

রাণী বললো–আমি জানতাম এমনি একটা বাধা এসে আমাদের প্রচেষ্টাকে নষ্ট করে দেবে এবং এ কারণে আমি ওকে আমার জাহাজে নিতে চাইনি।

চন্দনা বললো–রাণী, আমি অতি সতর্কতার সঙ্গে ছিলাম।

তবে ও জানলো কি করে?

এবার দিপালী বলে উঠলো–আমার মন বলে দিয়েছে, আমার মন বলেছে....এবার দিপালী রাণীর দুহাত জাপটে ধরে–ওকে তোমরা বিপদের মুখে

ঠেলে দিও না। ভীষণ বিপদ উৎরে আমরা পৃথিবীর বুকে ফিরে এসেছি.....

দস্যুরাণী কঠিন কণ্ঠে বললো–চন্দনা, ওকে নিয়ে যাও। নিয়ে যাও এখান থেকে।

চন্দনা দিপালীর হাতখানা চেপে ধরে জোর পূর্বক টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করলো কিন্তু দিপালীকে সে একটু নাড়াতে পারলো না।

এবার বনহুর বললো–দিপালী, তুমি মিছামিছি ভয় পাচ্ছো বরং তুমি আমাকে উৎসাহিত করবে বলে আমি আশা করছি।

না রাজকুমার, আমি আপনাকে কিছুতেই এ ভয়ংকর সমুদ্র গর্ভে নামতে দিব না....দিপালী দুহাতে বনহুরকে আরও জাপটে ধরে।

বনহুর তাকালো দস্যুরাণীর দিকে। তারপর দিপালীর হাত ধরে বললো–কিছু ভেবো না, এর চেয়ে অনেক ভয়ংকর বিপদকে আমি জয় করেছি দিপালী। এই নাও....বনহুর নিজ গলা থেকে সেই নীল পাথরযুক্ত মালাটা খুলে দিপালীর দিকে বাড়িয়ে ধরলো–নাও এটা রাখো দিপালী।

দিপালী অশ্রুসিক্ত নয়নে বললো–না, ওটা আমি রাখতে পারবো না। আপনার চেয়ে মূল্যবান কি ঐ পাথর? আমি আপনাকে যেতে দিব না।

বনহুর এবার বললো–তুমি এখানেই অপেক্ষা করো দিপালী, আমি ফিরে আসবো। তুমি ভেবো না...

দস্যুরাণী হাত ধরে ফেললো দিপালীর।

বনহুর দ্রুত চলে গেলো।

অন্যান্য ডুবুরী যারা বনহুরকে সাহায্য করবে বলে প্রস্তুত ছিলো তারাও নেমে গেলো সিঁড়ি বেয়ে নিচে বনহুরের পিছনে।

চন্দনা দিপালীর হাত ধরে নিয়ে চললো তার ক্যাবিনে।

দস্যুরাণী এবং কয়েকজন অনুচর অদ্ভুত মেশিনটার উপরে উঠে দাঁড়ালো। মেশিনটির এক পাশে ছিলো টেলিভিশন পর্দা। রাণী টেলিভিশন পর্দায় দৃষ্টি রেখে

দেখতে লাগলো।

গভীর জলদেশের নিচে হলেও বনহুরের সঙ্গে ক্যামেরা খুব বলিষ্ঠতার সঙ্গে কাজ করছে। টেলিভিশন পর্দায় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে বনহুরের চার পাশে মাছের মত ডুবুরীগণ এগিয়ে চলেছে। সবাই বিক্ষিপ্তভাবে অগ্রসর হচ্ছে দেখা যাচ্ছে। ছোট বড় পর্বত মালার মত অগণিত পর্বতমালা। নানা রকম উদ্ভিদ এবং শ্যাওলা জাতীয় সবুজ পদার্থ। স্তরে স্তরে সাজানো প্রবাল, প্রবালের ধারে। ধারে বিচরণ করে ফিরছে বিভিন্ন ধরনের জীব।

কোনোটা মাছের মত, কোনোটা গোলাকার চাক্তির মত; আবার কোনো কোনোটা লম্বা দড়ির মত। এক ধরনের জীব নজরে পড়লো যার আকৃতি মেষ শাবকের মত কিন্তু দুপাশে ডানা আছে এবং লেজ আছে।

দস্যুরাণী অবাক হয়ে সব লক্ষ্য করছে।

এখনও বিধ্বস্ত জাহাজ লংলুর কোন অংশ নজরে পড়ছে না।

সর্বাগ্রে এগিয়ে যাচ্ছে বনহুর।

দস্যুরাণী অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে লক্ষ্য করছে। তার চোখে মুখে উত্তেজনার ছাপ। তার বিশ্বস্ত অনুচর রহমত জাহাজ রাণীর তলদেশে মেশিনাদি নিয়ে ব্যস্ত রয়েছে। এখনও সে ফিরে আসেনি।

রহমত না আসা পর্যন্ত রাণী স্বস্তি পাচ্ছিলো না। এবার রাণী একটি মেশিনের সুইচ টিপে দিয়ে গম্ভীর গলায় বললো–রহমত, তুমি চলে এসো তোমার কাজ কি শেষ হয়েছে।

ওপাশ থেকে ফিরে এলো রহমতের কণ্ঠস্বর–কাজ শেষ হয়েছে রাণীজী আমি এক্ষুণি এসে পড়বে।

দস্যুরাণী সুইচ অন করে দিয়ে অপর আর এক জনের সঙ্গে কথা বললো–তোমরা ঠিক ভাবে কাজ করবে যেন বনহুরের কোনো ক্ষতি না হয়। ওয়্যারলেস মেশিন এবং অক্সিজেন পাঠানোর লাইন যেন ঠিক থাকে।

ওপাশ হতে জানালো দস্যুরাণীর অনুচর রুস্তম আলী–রাণীজী আমরা অত্যন্ত সতর্কভাবে কাজ করছি আশা করি বনহুরের কোন বিপদ হবে না।

না হলেই আমি খুশি হবো, কারণ বনহুরের জীবনের মূল্য ঐ মূল্যবান বস্তুর চেয়ে অনেক অনেক বেশি। ওকে হেফাযতে রাখতে হবে

আপনার কথা আমাদের স্মরণ থাকবে রাণীজী।

হা অত্যন্ত বুদ্ধির সঙ্গে তোমরা কাজ করবে।

এমন সময় রহমত এসে দাঁড়ালো রাণীর পাশে। কুর্ণিশ জানিয়ে বললো–রাণীজী সবগুলো মেশিন ঠিকমত কাজ করছে। আমরা নিচে টেলিভিশন যন্ত্রের সংলগ্ন পর্দায় দেখলাম বনহুর অন্যান্যদের সঙ্গে সমুদ্র গর্ভে এগুচ্ছে।

বললো রাণী–হাঁ, বনহুর ঠিকভাবেই এগুচ্ছে, কথা শেষ না করেই আনন্দধ্বনি করে উঠলো–রহমত দেখো দেখো জাহাজ লংলুর ভগ্নাংশ দেখা যাচ্ছে।

রহমত ভালভাবে লক্ষ্য করে দেখলো বনহুর সাঁতার কেটে এগুচ্ছে আর তার সম্মুখে দূরে সেই অতি আকাঙ্ক্ষিত বিধ্বস্ত লংলু! রাণীর চোখ দুটো দীপ্ত উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

ওদিকে চন্দনা দিপালীকে নানাভাবে ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা করছে। দিপালী কিছুতেই বনহুরকে সিমুদ্র গর্ভে নামতে দেবে না। কথাটা সে প্রথমে জানতো না, পরে জানতে পারে। চন্দনা কোনো অনুচরের সঙ্গে এ ব্যাপারে আলোচনা করছিলো, সে সময় দিপালী আড়াল থেকে সব শুনে ফেলে এবং তখনই সে দৌড়ে গিয়েছিলো তার রাজকুমারের পাশে কিন্তু সে বনহুরকে এ ব্যাপারে ধরে রাখতে পারেনি–দস্যুরাণীর নির্দেশে দিপালীকে আটক রাখা হয়েছে।

চন্দনা তখন থেকে অনবরত দিপালীকে নানাভাবে বোঝাচ্ছে, কিন্তু দিপালীকে কিছুতেই সান্ত্বনা দিতে পারছে না সে।

দিপালী বলছে–আমাকে হত্যা করে তারপর আমার রাজকুমারকে তোমরা সমুদ্র তলে পাঠাও। আমি জানি সে আর ফিরে আসবে না।

দিপালী যা ভাবছে তা সত্য। বনহুরকে এরা হাতে পেয়ে তাকে দিয়ে যা সম্ভব নয় তাই করানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এ কাজে বনহুরের মৃত্যুও ঘটতে পারে। দিপালী নিজ কানে শুনেছে বিধ্বস্ত জাহাজটার অভ্যন্তরে রয়েছে ভয়ংকর ভয়ংকর অজগর এবং আরও ভয়ংকর জীব। এর পূর্বে একবার ডুবন্ত লংলুর উদ্ধারের চেষ্টা চালানো হয়েছিলো কিন্তু সম্ভব হয়নি। যে ডুবুরীগণ বিধবস্ত লংলু উদ্ধারে সমুদ্রগর্তে প্রবেশ করেছিলো তারা কেউ ফিরে আসে নি।

এতো জানার পর দিপালীর মনের অবস্থা সাংঘাতিকভাবে ভীত আতঙ্কিক হয়ে পড়েছে। বনহুর ছাড়া তার আর কেউ নেই, কিছু নেই। মঙ্গল গ্রহ থেকে পৃথিবীতে ফিরে আসার পর বনহুর আর দিপালীর যখন জ্ঞান ফিরে এলো তখন বুঝতে পারলে তারা মুক্ত নয়, বন্দী। পরে আরও জানলো তারা এখন কারো হাতে বন্দী হয়েছে যে অত্যন্ত শক্তিশালী ব্যক্তি। দিপালী আরও জানতে পারলো দস্যুরাণীর কবলে তারা বন্দী হয়েছে।

দিপালীর সংজ্ঞা ফিরে আসার পর সে নিজের পাশে কাউকে দেখতে পায়নি। একটি বন্ধ ঘরের মধ্যে সে শুয়েছিলো, পাশে একটি পাত্রে কিছু পানি ছিলো। তবে একটু পরই তার কক্ষে প্রবেশ করেছিলো চন্দনা। অবশ্য প্রথম নজরেই ওকে ভাল লেগেছিলো দিপালীর। মেয়েটির বড় মিষ্টি চেহারা, ভরসা পেয়েছিলো সে তেমন কোন ভয়ংকর স্থানে নেই। অবশ্য দিপালী তখন জানতোনা এখন তারা কোথায় পৃথিবীতে না অন্য কোন জায়গায়। সবচেয়ে বেশি চিন্তিত হয়েছিলো দিপালী বনহুরকে না দেখে।

তারপর সে জানতে পারে তার রাজকুমার জীবিত আছে এবং সে এখন দস্যুরাণীর হাতে বন্দী আছে। দিপালী তবু স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলো সেদিন। তার কদিন পর বনহুরের সাক্ষাৎ লাভ ঘটেছিলো তার ভাগ্যে। সেদিন দিপালী আনন্দ অশ্রু ধরে রাখতে পারেনি। উজ্জ্বল কণ্ঠে বলেছিলো–রাজকুমার আমরা আবার পৃথিবীর বুকে ফিরে আসতে পেরেছি।

বনহুর বলেছিলো–হা আমরা এখন মঙ্গল গ্রহ ত্যাগ করে পৃথিবীর বুকে ফিরে এসেছি। আর কোন চিন্তা নাই…

কিন্তু কই, চিন্তা থেকে দিপালীতে পরিত্রাণ পেলোনা। দস্যুরাণী তার রাজকুমারকে মৃত্যু গহ্বরে পাঠিয়েছে। আর সে ফিরে আসবে কিনা তাই বা কে জানে।

চন্দনার আজ অনেক কথা মনে পড়ছে।

প্রথম যেদিন সে তাকে দেখেছিলো সেদিন হতে আজ পর্যন্ত যত ঘটনা সব আজ তার মনে উদয় হচ্ছে। সে ছাড়া আর কেউ নেই–কিছু নেই তার…

গভবেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে দিপালীর।

চন্দনা বলে উঠলো–বোন তুমি অহেতুক ভাবছো। তোমার রাজকুমার ঠিক্ ফিরে আসবে।

ফিরে তাকালো দিপালী চন্দনার মুখের দিকে।

চন্দনা সরে এলো আরও কাছে।

দিপালীর মাথায় হাত বুলিয়ে বললো–আমি সব বুঝতে পারছি। সত্যি তোমার ভালবাসার প্রশংসা না করে পারছি না। বনহুরকে তুমি শুধু ভালই বেসে চলেছে প্রতিদান তুমি চাওনা।

দিপালী নিশ্চুপ।

মন তার চলে গেছে অনেক দূরে গভীর সাগর তলে বনহুরের পাশে। ডুবুরীর বেশে সাঁতার কেটে সন্ধান করে ফিরছে সে বিধ্বস্ত জাহাজ লংলুকে। হয়তো বা হিংস্র কোনো জীবের সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে পড়বে তখন বনহুর আর রক্ষা পাবে না…..

দিপালী কি ভাবছো বোন?

কিছু না।

মিথ্যে কথা, তুমি যা ভাবছো তা আমি জানি।

তাহলে কেন আমাকে জিজ্ঞাসা করছো?

শোন দিপালী তুমি নিশ্চিন্ত থাকো তোমার রাজকুমারের কোনো ক্ষতি সাধন হবে না।

তুমি কি করে বুঝলে, তার কোন ক্ষতি সাধন হবে না?

না, হতে পারে না আমি জানি।

বোন তোমার কথা যেন সত্য হয়।

আচ্ছা দিপালী, সত্যি করে বলো তো দস্যু বনহুর কে এবং তার পরিচয় কি?

আমি যতটুকু জানি বলতে পারি তার বেশি আমি জানি না।

চন্দনা বললো–অনেক দিন থেকে দস্যু বনহুর সম্বন্ধে অনেক কথা শুনে এসেছি তা কি সত্যি? আমি তোমাকে কয়েকটি প্রশ্ন করবো দিপালী তুমি সঠিক জবাব দেবে তো?

দিপালী বুঝতে পারলো চন্দনা তাকে অন্যমনস্ক রাখতে চায়। অতি দুঃখেও হাসি পাচ্ছিলো দিপালীর তবু সে বললো–দেবো।

চন্দনা বললো–বনহুর সম্বন্ধে আমি প্রথম জানতে চাই তোমার সঙ্গে তার পরিচয় কোথায়?

দিপালী একটা নিঃশ্বাস ত্যাগ করে বললো– সে বহুদিন আগের কথা, কোনো এক হোটেলে তার সঙ্গে আমার পরিচয়। একদিন আমি..... দিপালী বলে চললো তার নিজের জীবন কাহিনী।

চন্দনা মনোযোগ সহকারে শুনে যাচ্ছিলো ওর কথাগুলো, বিস্ময়ে তখনও দুচোখ বিস্ফারিত হচ্ছিলো তার। দিপালী যা বলছিলো সত্যি আশ্চর্যজনক বটে।

দিপালী বলে চলেছে–আমি নর্তকী ছিলাম। বহু পুরুষ আমি দেখেছি কিন্তু আমার রাজকুমারের মত আমি কাউকে দেখিনি। মানুষ নয় দেবতা....

এখানে যখন দিপালী আর চন্দনা কথা বার্তা হচ্ছিলো তখন দস্যুরাণী অদ্ভুত টেলিভিশনটার সম্মুখে দাঁড়িয়ে সব লক্ষ্য করছিলো। আশ্চর্য হচ্ছিলো সে সমুদ্রের তলদেশের ভীষণ আর ভয়ংকর রূপ দেখে। ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে দেখা যাচ্ছে বিধ্বস্ত লংলুর বিরাট অংশ। কতগুলো ছোট খাটো পাহাড়ের মধ্যে কাৎ হয়ে পড়ে আছে বিধ্বস্ত জাহাজখানা। বিরাট আর ভয়ংকর মনে হচ্ছে ওটাকে। দস্যুরাণীর

মুখমন্ডল কঠিন হয়ে উঠলো। বললো সে রহমতকে লক্ষ্য করে–লংলু উদ্ধারে বহু ডুবুরী প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে তারা লংলুর ভিতরে প্রবেশ করে আর বেরুতে পারেনি। জানি না তাদের পরিণতি কি হয়েছে।

হা রাণীজী সবাই অবাক এবং আতঙ্কিত কারণ বার বার লংলু উদ্ধারের প্রচেষ্টা চালিযেও কোন ফল হয়নি। যে ডুবুরী বিধ্বস্ত লংলুতে প্রবেশ করেছে সে আর বের হতে পারেনি। কথাগুলো বললো রহমত।

আমি নিজেও এ ব্যাপারে কম অবাক হইনি রহমত। বনহুরকে পাঠিয়ে আমি মোটেই স্বস্তি পাচ্ছি না। কথাগুলো বলে দস্যুরাণী ললাটে হাত রাখলো।

রহমত বললো–দেখুন রাণীজী বনহুরের সঙ্গে যে ডুবুরীরা এগুচ্ছিলো তারা এলো মেলো হয়ে গেছে। তারা মোটেই অগ্রসর হচ্ছে না।

দস্যুরাণী পুনরায় টেলিভিশন পর্দায় গভীর মনোযোগ সহকারে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো। কেমন যেন ফ্যাকাশে লাগলো দস্যুরাণীর মুখমন্ডল। রাণীর অনুচর যারা ডুবুরীর কাজে অভ্যস্ত তারা গিয়েছিলো বনহুরকে সাহায্য করার জন্য কিন্তু তারা বিধ্বস্ত লংলুর নিকটবর্তী হয়েই সবাই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে।

সাউন্ড বক্সে কোন কথা শোনা যাচ্ছে না এখন।

এতোক্ষণ বনহুরের কণ্ঠস্বর স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিলো। একটু পূর্বেও সে জানিয়েছে, আমরা ভালোভাবে এগুচ্ছি। আমার সঙ্গে অন্যান্য যারা আমার সাহায্যকারীরূপে এসেছে তারাও এগুচ্ছে। আমরা এখন বিধবস্ত লংলু দেখতে পাচ্ছি...একটা আলোড়ন লক্ষ্য করছি সমুদ্রগর্ভে...হয়তো ঘুর্ণিয়মান জলোচ্ছাস এর সূত্র এখানে রয়েছে সাঁতার কাটতে কষ্ট হচ্ছে কারণ ঘুর্ণিয়মান জলোচ্ছাস এর বেগ অত্যন্ত প্রবল...

দস্যুরাণীর মুখে একটা হতাশার চিহ্ন ক্রমান্বয়ে ফুটে উঠলো। বললো দস্যুরাণী তবে কি সাউন্ড বক্সটি অকেজো হয়ে গেছে....

রহমত বললো–হয়তো তাই হবে। না হলে এতোক্ষণ বনহুর ঠিক ভাবে কথাগুলোকে পৌঁছে দিতে পারলেও এখন কেনো পারছে না? ওকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে....

হাঁ বনহুরকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে…..অন্যান্য ডুবুরীগণ বিক্ষিপ্তভাবে ঘুর পাক খেয়ে এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়ছে। জলস্রোত এখানে ভীষণ প্রখর বলে মনে হচ্ছে…রহমত দেখ বনহুর তবু এগুচ্ছে।

কিন্তু এখন কোন সাউন্ড শোনা যাচ্ছে না তবে কি সাউন্ড বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো। বললো রহমত।

অপর আর একজন অনুচর যে সুইচ টিপছিলো সে বললো–হাঁ সেই রকমই মনে হচ্ছে।

দস্যুরাণী নিজে এবার মাইক্রোফোন টেলিস্কোপটা কানে পরে নিলো এবং মাইক্রোফোনের যন্ত্রের সুইচ টিপতে শুরু কররো।

না কোন সাউন্ড আসছে না তবে টেলিভিশন পর্দায় সব কিছু স্পষ্ট ভেবে আসছে কিন্তু এলোমেলো লাগছে।

বনহুর অগ্রসর হচ্ছে বিধ্বস্ত লংলুর দিকে।

তার সঙ্গী ডুবুরীগণ বিচ্ছিন্নভাবে চারদিকে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

হঠাৎ সাউন্ড বক্সে কথা শোনা গেলো, বনহুরের গলা….এখানে সমুদ্রগর্ভে ভয়ংকর জলোচ্ছাস লক্ষ্য করছি …সমুদ্র তলে নিশ্চিয়ই কোন গভীর ফাটল বা ঐ ধরনের কিছু আছে মোটেই অগ্রসর হওয়া সম্ভব হচ্ছে না…আমার সঙ্গীরা সব বিচ্ছিন্নভাবে কে কোথায় ভেসে গেলো…..আমি বিধ্বস্ত লংলু দেখতে পাচ্ছি….

দস্যুরাণী সাউন্ড শুনে খুশি হয়ে উঠলো, সে বুঝতে পারল কোন কারণে সাউন্ড বক্স অকেজো হয়ে পড়েছিলো। এখন সে কাজ করছে। দস্যুরাণীর চোখ দুটো খুশিতে দীপ্ত হয়ে উঠলো, বললো সেবনহুর তুমি জয়ী হও…..আমি তোমাকে দেখতে পাচ্ছি। …..তোমার সঙ্গীরা প্রবল জলোস সহ্য করতে পারলোনা…..ওরা বড় অপদার্থ… তুমি জয়ী হবে বনহুর…

…..লংলুর অতি নিকটে এসে পড়েছি হয়তো পুনরায় সাইন্ড বক্স বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে….হয়তো টেলিভিশন ক্যামেরা বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে যে রকম প্রচন্ড জলোচ্ছ্বাস তাতে কোনো কিছুই টিকে থাকতে পারে না

দস্যুরাণী বলে ....আমি আশা করছি তুমি সমস্ত বিপদকে জয় করবে–বনহুর, বনহুর.....একি এলোমেলো হয়ে গেলো সব কিছু.. রহমত, রহমত ....

বলুন রাণীজী?

একি হলো টেলিভিশন ক্যামেরা বিনষ্ট হয়ে গেলো। দেখছো না–....

ঠিক ঐ মুহূর্তে ভেসে আসে বনহুরের অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর...বিধ্বস্ত লংলুর মধ্য হতে একটি ভয়ংকর শব্দ শোনা যাচ্ছে.....এখন জলস্রোত আরও ভীষণ আকারে আমাকে টানছে.....আমি চেষ্টা করছি বিধ্বস্ত লংলুর দিকে এগুতে

রাণী বলে উঠলো–বনহুর তুমি ফিরে এসো...ফিরে এসো ...এক মুহূর্ত বিলম্ব করোনা...ফিরে এসো.....

কিন্তু কোনো শব্দই আর শোনা যাচ্ছে না।

রহমত বলে উঠলো–রাণীজী সর্বনাশ হয়েছে। সাউন্ড বক্স নষ্ট হয়ে গেছে....সাউন্ড বক্স নষ্ট হয়ে গেছে। এখন উপায়, রাণীজী.....

জাহাজ রাণীর নিচে সিঁড়ি ঝুলিয়ে দাও। দেখো রহমত সাউন্ড এবং টেলিভিশন দুটো এক সঙ্গে অকেজো হয়ে গেছে। ঝাপসা হয়ে গেছে টেলিভিশন পর্দা।

রাণী ললাটে হাত রেখে বললো–যা ভাবছিলাম তাই হলো। রহমত আমার সঙ্গে নিচে চলে এসো....রাণী কথাটা বলে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে গেলো এবং সমুদ্র তলদেশ পরীক্ষা করার যে সার্চ লাইট আছে জ্বেলে ফেললো। তীব্র আলোর রশ্মি ছড়িয়ে পড়লো জাহাজের তলদেশের ছিদ্র পথে সমুদ্র গর্ভে। কিন্তু কিছুই নজরে পড়ছে না।

রহমত মাইক্রোফোনে মুখ রেখে সমুদ্র তলে কথা ছড়িয়ে দিচ্ছে কিন্তু কোনো জবাব ভেসে আসছে না।

রাণীর চোখে মুখে আতঙ্কের ছাপ ফুটে উঠেছে। উত্তেজিত কণ্ঠে বললো রাণী– আমার অন্যান অনুচর ডুরীগণ তারা কোথায় গেলো? এখনও কেউ ফিরে আসেনি....

এমন সময় ক্যাপ্টেন জিলানী পিছন থেকে বলে উঠলো রাণীজী আমাদের নয় জন ডুবুরীর মধ্যে পাঁচ জন ডুবুরী ফিরে আসতে সক্ষম হয়েছে।

কই কোথায় তারা বললো রাণী।

ক্যাপ্টেন বললো–তারা সিঁড়ি মুখে আছে। কথাটা বলে পাশের সুইচ টিপলো সে।

সঙ্গে সঙ্গে পাশের ক্যাবিনের দরজা খুলে গেলো। দেখা গেলো কয়েক জন ডুবুরী পোশাক পরা অবস্থায় ক্যাবিনের মেঝেতে পড়ে আছে। কেউ কেউ ড্রেস পরিবর্তন করছে।

এ ক্যাবিনটা ছিলো জাহাজের তলদেশের একটি বিশেষ অংশে। জাহাজ রাণীর অভ্যন্তরে এমনি ধরনের বহু চোরা ক্যাবিন রয়েছে। রাণী এখন যে ক্যাবিনটির মধ্যে দাঁড়িয়ে সমুদ্রগভর্ণ সার্চলাইট দ্বারা পরিদর্শন করছিলো সেই ক্যাবিনটি খোলসের গোপন মেশিন ঘর। অবশ্য এই ঘরটির তলদেশে রয়েছে একটা অদ্ভুত যন্ত্র–যা দ্বারা দস্যুরাণী এ জাহাজ থেকে অপর এক ডুবু জাহাজে অতি সহজে স্থানান্তর হতে পারে।

দস্যুরাণী প্রবেশ করলো ডুবুরীদের ক্যাবিনে।

ব্যস্ত কণ্ঠে বললো–তোমরা বলো কি সংবাদ?

একজন ডুবুরী কিছু সুস্থ ছিলো সে বললো–রাণীজী বড় দুঃসংবাদ। আমরা যখন বিদ্ধস্ত লালু দেখতে পেলাম তখন খুশি হয়েছি কিন্তু এমন প্রবল জলোচ্ছাস হচ্ছিলো যে আমরা এক মুহূর্ত স্থির থাকতে পারছিলাম না। আমাদের টেনে নিয়ে যাচ্ছিলো সেই ঘূর্ণিয়মান জলোচ্ছাসের দিকে।

হাঁ আমি নিজেও লক্ষ্য করেছি।

অপর একজন ডুবুরী বলে উঠলো–আমার সঙ্গী জলোমাসের টানে ভেসে গেলো, আমার চোখের সামনে এই দৃশ্য আমি দেখলাম.....

রাণীজী আমার সামনে দুজন ও গেছে–আমিও প্রায় গিয়েছিলাম হঠাৎ ভাগ্য ক্রমে বেঁচে গেছি। আমার সঙ্গী দুজন জলোচ্ছাসের টানে ভেসে গেলো এবং

জলোচ্ছাসটি ডুবুরী দুজনকে বিরাট একটি গহ্বরে জলোচ্ছাস সহ টেনে নিলো। রাণীজী আমরা বাধ্য হয়ে ফিরে এসেছি...

আর দুজন ডুবুরী তারা প্রায় সংজ্ঞাহীন ছিলো। এ কারণে তাদের কাছে কিছু জানতে পারা গেলোনা। তারা মৃতের মত মেঝেতে পড়েছিলো।

রাণী তাদেরকে সুস্থ করে তোলার জন্য অন্যান্য অনুচরদের সাহায্য করতে বললো।

বেরিয়ে এলো রাণী দ্রুতগতিতে।

পুনরায় সে দৃষ্টি রাখলে সার্চলাইটে, না কোনো কিছু নজরে পড়ছে না শুধু জলজীব আর জলীয় উদ্ভিদ ছাড়া। ছোট ছোট ডুবন্ত পাহাড়গুলোকে এক একটা দৈত্য বলে মনে হচ্ছে। বনহুর এর মধ্যে কোথায় হারিয়ে গেছে কে জানে।

দস্যুরাণীর ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠলো। মুখমন্ডল কঠিন হয়ে উঠেছে। বার বার সে সার্চ লাইটে ফিট করা দূরবীক্ষণ যন্ত্রে চোখ রেখে সমুদ্রতলদেশ দেখবার চেষ্টা করছিলো।

রহমত বলে উঠলো–রাণীজী...

দস্যুরাণী দৃষ্টি ফেললো রহমতের মুখের দিকে, সে চোখে একটা উদ্ভ্রান্তের ছাপ ফুটে উঠেছে।

*

বনহুর ভয়ংকর জলোচ্ছাসকে পরাহত করে বিধ্বস্ত লংলুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

একদিকে ভয়ংকর জলোচ্ছাস অপর দিকে বিধ্বস্ত লংলু তাকে টানছে। বিধ্বস্ত লংলুর ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছে একটা ভীষণ শব্দ। শব্দটা থেমে থেমে হচ্ছে। বনহুর বুঝতে পারছেনা এ শব্দটা কিসের। তার সঙ্গে ফিট করা ছিলো সাউন্ড বক্স যন্ত্র, ছিলো দিকদর্শন যন্ত্র, আরও ছিলো টেলিভিশন ক্যামেরা, সব অকেজো হয়ে পড়েছে ভীষণ জলোচ্ছাসের আঘাতে। অক্সিজেন পাইপটি এখনও ঠিক আছে

আর ঠিক রয়েছে তার হাতের ক্ষুদে যন্ত্র যে যন্ত্রের দ্বারা বনহুর জানতে পারবে কোথায় আছে সেই মহামূল্যবান বস্তুটা।

বনহুর মরিয়া হয়ে সাঁতার কাটছে।

ভয়ংকর জলোচ্ছাস তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে সমুদ্রের তলদেশে বিরাট ভয়াবহ খাতটার দিকে।

বনহুর বুঝতে পারছে সমুদ্র তলে বিরাট ফাটল বা গহ্বর রয়েছে। সেই গহ্বরে সমুদ্রের জলরাশি ঘূর্ণীয়মান অবস্থায় প্রবেশ করছে। জলরাশি একসঙ্গে ঐ গহবরে প্রবেশ করায় সমুদ্র তলে জলোচ্ছাস ঝড়ের বেগে টেনে নিচ্ছে সব কিছু। বিধ্বস্ত লংলুর ছোট খাটো অংশগুলি চলে গেছে। জলোচ্ছাসের টানে ঐ গহ্বরে। লংলুর বিরাট অংশ তলদেশটা পড়ে আছে এখনও। ওটাকে জলোচ্ছাস টেনে নিয়ে যেতে পারেনি এখনও।

দুঃসাহসিক বনহুর ভীষণ জলোচ্ছাসকে পরাজিত করে প্রায় লং কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। বিধ্বস্ত লংলু তাকে আকর্ষণ করছে। কোনোক্রমে একটি বার লংলুর দেহ স্পর্শ করতে পারলেই জয়ী হবে সে।

অক্সিজেন ঠিক ভাবে কাজ করছে।

নিঃশ্বাস নিতে কিছু মাত্র তার কষ্ট হচ্ছে না। হাতে ক্ষুদে যন্ত্রটার দিকে বনহুর তাকিয়ে দেখছে। না ওটা স্থির হয়েই আছে। যেখানে আশে পাশে সেই মহামূল্যবান বস্তুটি থাকবে সেখানে কাটাটি অত্যন্ত জোরে নড়তে থাকবে।

বনহুর–এর সঙ্গে জাহাজ রাণীর সংযোগ জলোচ্ছাসের আঘাতে বিনষ্ট হয়ে গেছে। কোন সাউণ্ড বা কিছু জানতে পারছে না বনহুর। অবস্থাও জানতে পারছে না সে। অত্যন্ত কষ্ট হচ্ছে। বনহুরের, সাঁতার কাটতে গিয়ে অবশ হয়ে আসছে তার সমস্ত শরীর।

তবুও এগুচ্ছে বনহুর।

অসংখ্য জলীয় জীব বনহুরের চারপাশে তাকে নানাভাবে আক্রমণ করার চেষ্টা করছে কিন্তু বনহুর তার দক্ষিণ হস্তে ছোরা বের করে নিয়েছে। ঐ ধারালো অস্ত্রদ্বারা সে জলজীবগুলোকে পরাস্ত করে অগ্রসর হচ্ছিলো এবার বিধ্বস্ত

লংলুর একেবারে কাছাকাছি এসে গেছে। বনহুর নির্ভয়ে প্রবেশ করলো লংলুর অভ্যন্তরে।

বনহুরের সঙ্গে ক্ষুদে সার্চ লাইট ছিলো, সেই লাইটের তীব্র আলোতে সে সবকিছু স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। বনহুর নিজের দক্ষিণ হাতে সুতীক্ষ্ণ ধার ছোরা এবং বাম হাতে বাঁধা রয়েছে সেই অদ্ভুত ক্ষুদে যন্ত্রটা, যার মধ্যে ধরা পড়বে মহামূল্যবান বস্তুটার অবস্থান।

অগ্রসর হচ্ছে বনহুর। বিধ্বস্ত লংলুর উদ্ধারে এসে বহু ডুবুরী প্রাণ হারিয়েছে। তারা আর পৃথিবীর বুকে ফিরে যেতে সক্ষম হয়নি।

বনহুর জীবন নিয়ে ফিরে আসতে পারবে কিনা তাই বা কে জানে।

একটা অদ্ভুত শব্দ কানে আসছে। এ ধরণের শব্দ বনহুরের সম্পূর্ণ অপরিচিত।

শব্দটা কেমন বিস্ময়কর মনে হচ্ছে।

বনহুর এ শব্দটা বিধ্বস্ত লংলুর নিকটবর্তী হতে তার কানে এসে পৌঁছে ছিলো। আন্দাজ করে নিয়ে ছিলো বনহুর এ শব্দ কোনো জীবের কণ্ঠ স্বর। কিন্তু জীবটা কি তা সে আন্দাজ করে নিতে পারেনি। তবে সমুদ্র তলে নানা ধরণের ভয়ংকর জীব রয়েছে তা সে জানে।

বিধ্বস্ত লংলুর অভ্যন্তরে সে কি ভীষণ আর ভয়ংকর রূপ। বনহুরও যেন শিউরে উঠলো, তবে কি সেও ফিরে যেতে পারবে না। বনহুর ক্ষুদে সার্চ লাইটের আলো ফেলে অগ্রসর হচ্ছে। দক্ষিণ হাতে তার অদ্ভুত ধরণের ছোরা।

ছোরা ছাড়াও আরও কয়েকটি আশ্চর্যজনক অস্ত্র তার সঙ্গে রয়েছে। বনহুর ইচ্ছা করলে অতিসহজে এসব অস্ত্র ব্যবহার করতে পারবে।

দস্যুরাণী বনহুরকে তার কাজে জয়ী হবার জন্য সবরকম সাবধানতা অবলম্বন করেছে। তবু কি ঘটবে ভেবে কেউ সঠিক চিন্তাধারায় পৌঁছতে পারছে না। বিশেষ করে সাউন্ড মেশিন এবং টেলিভিশন ক্যামেরা বিনষ্ট হয়ে যাওয়ায় দস্যুরাণী এবং তার অনুচরগণ ভড়কে গেছে।

বনহুর কিন্তু মোটেই বিচলিত হয়নি।

মৃত্যুকে সে ভয় পায় না কোনদিন, আজও পায়নি।

বনহুর লংলুর গভীর তলদেশে প্রবেশ করলো।

বহুকুঠরী রয়েছে যা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়নি। থৈ থৈ করছে জল রাশি। নানা ধরনের ছোট খাটো সামুদ্রিক জীব নজরে পড়ছে।

বনহুর লক্ষ্য করছে হাতে বাধা যন্ত্রটা।

যার মধ্যে ধরা পড়বে সেই অমূল্য সম্পদ।

ভাবছে বনহুর লংলু উদ্ধারে এসে কেউ ফিরে যেতে পারেনি, তবে মনে হয় তারা ভয়ংকর জলোচ্ছাস থেকে রেহাই পায়নি…

হঠাৎ বনহুরকে পিছন থেকে কে যেন বেষ্টন করে ধরলো।

বনহুর মুহূর্তে ফিরে তাকলো।

শব্দটা এখন সম্পূর্ণ থেমে গেছে। একটু পূর্বেও যে অদ্ভুত শব্দটা শোনা যাচ্ছিলো তা একেবারে নিশ্চুপ। বনহুর ফিরে তাকাতেই দেখলো বিধ্বস্ত লংলুর অভ্যন্তর থেকে একটি বিরাট আকার বাহু তার দেহটার ঠিক মাঝামাঝি বেষ্টন করে ধরেছে।

বনহুর ভাল ভাবে লক্ষ্য করলে সেই বাহুটি কিসের। কিন্তু বেশিক্ষণ ভাবার সময় নেই, বাহুটি তাকে ভীষণ ভাবে জড়িয়ে ধরেছে।

ওদিকে দস্যুরাণী তখন ভীষণ ভাবে চিন্তিত, ব্যস্ত উদ্ভ্রান্ত হয়ে পড়েছে। বার বার টেলিভিশন সুইচ টিপছিলো এবং সার্চ লাইট ফেলে সমুদ্রের তলদেশ দেখবার চেষ্টা করছিলো।

হঠাৎ টেলিভিশন পর্দায় দেখা গেলো লংসুর ভগ্নাংশের মধ্যে বিরাট একটি বাহু বা হস্তি শুড়ের সঙ্গে লড়াই করছে বনহুর।

দস্যুরাণী বুঝতে পারলো বনহুরের সংগে যে ক্যামেরা রয়েছে সেই ক্যামেরা হঠাৎ করে অকেজো হয়ে পড়লেও এখন সেটা কাজ করছে। দুচোখে বিস্ময়, শুধু দস্যুরাণীর নয় তার অনুচরগণের চোখে মুখেও ভীষণ বিস্ময় আর আতঙ্কের ছাপ

ফুটে উঠেছে। ওরা হতভম্ব হয়ে কোনো কারণ হঠাৎ কি করে ক্যামেরা ঠিক হলো এবং বিধ্বস্ত লংলুর অভ্যন্তরের ছবি ভেসে এলো।

বনহুর নিজেও বুঝতে পারেনি কখন তার শরীরে ফিট করা টেলিভিশন ক্যামেরা হঠাৎ করে ঠিক হয়ে গেছে। জলোচ্ছাসের প্রবল বেগে সুইচ অফ হয়ে গিয়েছিলো। সেটা আবার চালু হয়ে গেছে তেমনি করে কিন্তু সাউন্ড বক্স একেবারে অকেজো হয়ে গেছে।

বনহুর নিজকে রক্ষা করার চেষ্টা করছে।

ছুরিকাঘাত করে চলেছে সে ঐ হস্তি খুঁড়ের মত বস্তুটার উপরে। কিন্তু একচুল ক্ষত সৃষ্টি হচ্ছে না বা কোন রক্তপাত হচ্ছে না।

বনহুর প্রথম মনে করলে তাকে যে অদ্ভুত বাহু বেষ্টন করেছে সেটা অক্টোপাশ কিন্তু পরে বুঝতে পারলো সেটা অক্টোপাশ নয় অদ্ভুত এক জীব। বিরাট অজগরের মত তার দেহ এবং মাথাটা গোলাকার একটি জালা বা প্রকান্ড ড্রামের মত।

অসীম শক্তিশালী এই জীবটা।

এতোক্ষণ যে শব্দটা বনহুর শুনতে পাচ্ছিলো তা এই জীবটার কণ্ঠ নালী থেকেই বের হচ্ছিলো তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

বনহুর এ ধরণের জীব এই প্রথম দেখছে। কিন্তু এসব নিয়ে ভাবার তার সময় নেই। কঠিন বাহুটি তাকে আরও জোরে চাপ দিচ্ছে তারপর তাকে টেনে নেবার চেষ্টা করছে বিরাট মুখ গহ্বরে।

বনহুর নানাভাবে নিজকে রক্ষার চেষ্টা করছে। সেকি ভীষণ শক্তি, আর বুঝি রক্ষা পাবে না সে। ভয়ংকর জলোচ্ছাসকে পরাহত করে বিধ্বস্ত লংলুর অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে সক্ষম হলো বনহুর কিন্তু এই ভয়াবহ জীবটার কবল থেকে উদ্ধার পাওয়া বড় মুস্কিল হয়ে পড়লো। বনহুর বুঝতে পারলো লংলু উদ্ধারে এসে কেউ ফিরে যেতে পারেনি কেনো।

যারাই লংলু উদ্ধারে এসেছে তাদের সবাইকে গ্রাস করেছে এই ভয়ংকর অদ্ভুত জীবটা।

দস্যুরাণীও বুঝতে পারছে কেননা লংলু উদ্ধারে এসে সমুদ্র তল থেকে ফিরে আসতে পারেনি ডুবুরীগণ। তার চোখে মুখে একটা দারুণ হতাশার ছায়া ফুটে উঠেছে। মাত্র কিছুক্ষণ দস্যুরাণী দেখতে পেলো তারপর হঠাৎ টেলিভিশন পর্দা পুনরায় ঝাপসা হয়ে গেলো।

বললো রাণী–রহমত, এবার বনহুরকে আমরা হারালাম। নিশ্চয়ই সেই ভয়ংকর জীবটা তাকে গ্রাস করেছে। কিন্তু এক মুহূর্ত বিলম্ব করো না তোমরা জাহাজ রাণীর তলদেশে সাবমেরিন প্রস্তুত করে নাও আমি নিজে যাবো।

রহমত ভীতভাবে বলে উঠলো–আপনি নিয়ে যাবেন রাণীজী?

হাঁ রহমত। বনহুর যদি সত্য মত্যবরণ করে থাকে তা হলে আমি ভীষণ দুঃখ পাবো আর যদি সে এখনও নীল নদের তলদেশে বিধ্বস্ত লংসুর সেই ভয়ংকর জীবটার সঙ্গে লড়াই করতে থাকে তবে আমি সাবমেরিন দিয়ে ঐ হস্তি বাহু আকার জীবটাকে হত্যা করবো…..

রাণীজী।

হাঁ আর মোটেই বিলম্ব করোনা।

কিন্তু।

বল রহমত থামলে কেন?

আপনার যাওয়াটা সমীচীন হবে না।

অহেতুক বাক্য ব্যয় করে সময় নষ্ট করোনা রহমত, যাও। আমি তৈরি হয়ে নিচ্ছি।

রহমত বিষণ্ন মনে দ্রুত চলে গেল।

জাহাজ রাণীর তলদেশে বিরাট আকার ছিদ্রপথ ছিলো ঐ ছিদ্র পথে সাবমেরিন ইঙ্গলকে বের করে আনলো রহমত। সাবমেরিন ইঙ্গল অত্যন্ত ভয়ংকর এবং গতি সম্পন্ন। রাণী ঈঙ্গল–এ চেপে বসার পূর্বে মারাত্মক অস্ত্র যা ইঙ্গলে

সংযোগ করা ছিলো সেটা ভালভাবে পরীক্ষা করে নিলো সে। ইঙ্গলের সব মেশিন ঠিক রয়েছে এবার রাণী চললো বনহুরকে সাহায্য করতে।

প্রবল জলোচ্ছাস ভেদ করে বিদ্যুৎ গতিতে ইঙ্গল অগ্রসর হলো বিধ্বস্ত লংলুর দিকে।

রহমত এবং রাণীর অন্যান্য অনুচরগণ ভীষণভাবে চিন্তিত এবং ব্যস্ত হয়ে পড়লো কারণ তাদের রাণীজী যখন অতি ভয়ংকর কোনো কারণে উপনীত হয় তখন সাবমেরিন ইঙ্গল ব্যবহার করে থাকে।

রাণী ইঙ্গল নিয়ে বিধ্বস্ত লংলুর দিকে এগিয়ে আসছে। প্রবল জলোচ্ছাস তাকে কাবু করতে পারলোনা। জলোচ্ছাস সাবমেরিন ইঙ্গলকে তেমন বাধা দিতে পারলোনা। কিছু সময়ের মধ্যে ইঙ্গল পৌঁছে গেলো লংসুর কাছাকাছি।

এবার রাণী ইঙ্গলের গতি মন্থর করে আনলো। চোখ তার দূরবীক্ষণ যন্ত্রে রয়েছে। রাণী স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে বিধবস্ত লংলুকে।

একটা ছোট খাটো পর্বতের মত মনে হয় প্রথমে, তবে ভাল ভাবে লক্ষ্য করলে বোঝা যায় সেটা পর্বত নয় একটি বিধ্বস্ত জাহাজ।

রাণী সাবমেরিনের গতি কমিয়ে দিয়ে ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে লাগলো। ভালভাবে লক্ষ্য করছে। সেই বিস্ময়কর জীব আর বনহুরকে দেখা যায় কিনা। কিন্তু না এখন কিছু সে দেখতে পাচ্ছে না। শুধু দেখতে পাচ্ছে নানা ধরনের সামুদ্রিক মাছ আর উদ্ভিদ ও ছোট খাটো নানা ধরণের প্রবালের স্তূপ।

রাণীর বুকটা ধক করে উঠলো।

তা হলে কি বনহুর চিরতরে হারিয়ে গেলো বিধ্বস্ত লংলুর অভ্যন্তরে। সেই ভয়ংকর জীবটা তা হলে গ্রাস করছে তাকে।

রাণী সাবমেরিন নিয়ে সোজা এসে পড়লো লংলুর অপর পাশে।

অপর পাশে আসতেই রাণী সাবমেরিনের আসনে বসে চমকে উঠলো, সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সেই বিরাট হস্তি শুড় জীবটা কেমন যেন উলোট পালোট করছে। লংলুর আশে পাশে জলরাশি তোলপাড় করছে ভীষণভাবে।

সাবমেরিন অত্যন্ত কাছে এসে পড়েছে।

স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে রাণী। জীবটার কিছু অংশ বিধ্বস্ত লংলুর ভিতরে কোনো একটা বস্তুর সঙ্গে বেষ্টন করে ছিলো এবং তার শেষাংশ দিয়ে আক্রমণ করেছিলো বনহুরকে।

কিন্তু কেন এ মুহূর্তে জীবটা অমনভাবে ঘুর পাক খাচ্ছে এবং সে উলটা পালট করছে? ব্যাপারটা যেন রহস্য জনক বলে মনে হচ্ছে। বনহুর কি তা হলে এখন ঐ জীবটার উদরে....সমুদ্র তলের পানি যেন তোলপাড় হচ্ছে।

রাণী মোটেই বিলম্ব না করে সাবমেরিনে ফিট করা ভয়ংকর কঠিন মারাত্মক অস্ত্রের সুইচ টিপলো। সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ বেগে সাবমেরিন থেকে বেরিয়ে গেলো গলিত সীসার টুকরো টুকরো খন্ড। সেই অদ্ভুত জীবটার দেহ ঝাঁঝরা করে দিলো সীসার টুকরোগুলো।

বনহুর বেঁচে আছে কিনা সন্দেহ।

দস্যুরাণী বেশ বুঝতে পারলো ঐ ভয়ংকর জীবটাই এতোদিন বিধ্বস্ত লংলুর উদ্ধার কার্যে যারা নীল নদ গর্ভে গমন করেছিলো তাদের হত্যা করে গিলে ফেলেছে—-কেউ ফিরে যেতে পারেনি আর পৃথিবীর বুকে। তবে কি বনহুরও আর কোনদিন পৃথিবীর বুকে ফিরে যাবে না। দিপালীকে কি বলে সান্তনা দেবে সে, মুহূর্তে তার মনে উদয় হলো কথাগুলো।

দস্যুরাণী লক্ষ্য করছে জীবটা এবার ক্রমান্বয়ে নীরব হয়ে আসছে। স্থির হয়ে আসছে হস্তিশূড় দেহটা তার। দস্যুরাণী সাবমেরিনসহ এবার বিধ্বস্ত লংলুর মধ্যে প্রবেশ করতে গেলো। ঠিক সেই মুহূর্তে জমকালো ডুবুরী ড্রেস পরা বনহুর বেরিয়ে এলো বিধ্বস্ত লংলুর ভিতর থেকে।

দস্যুরাণী সাবমেরিনের সম্মুখ শার্শীর ছিদ্রপথে দেখতে পেলো এবং মুহূর্তে দস্যুরাণীর চোখ দুটো দীপ্ত হয়ে উঠলো। বনহু তা হলে মৃত্যুবরণ করেনি। সে জীবিত আছে।

ভালভাবে লক্ষ্য করতেই রাণী আরও বেশি খুশিতে উচ্ছল হলো বনহুরের হাতে দেখতে পেলো সে একটি বাক্স আকার বস্তু।

দস্যুরাণী তার সাবমেরিনের গতি পূর্বেই মন্থর করে দিয়েছিলো। এবার এগুতে লাগলো সে বনহুরের দিকে।

বনহুর কিন্তু চিনতে পারে, বুঝতে পারে এটা দস্যুরাণীর কোনো একটি যান। নিশ্চয়ই ঐ যানের মধ্যে আছে দস্যুরাণী।

যানটি অতি ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছিলো।

বনহুর এবার স্থির হয়ে দাঁড়াতেই চেষ্টা করলো। হাতে তার সেই মূল্যবান সম্পদের বাক্সটি। অপর হাতে মারাত্মক অস্ত্র।

দস্যুরাণীর যানটি নিকটবর্তী হয়েই সামান্য একটু এগুলো তারপর খুলে ফেললো দরজা। যানটির দরজা খুলে যেতেই একটা সিঁড়িমুখ বেরিয়ে এলো।

বনহুর সাঁতার কেটে যানটির পাশে এসে সিঁড়ি মুখে প্রবেশ করলো।

দস্যুরাণী তাকে ইংগিত করলে পাশে বসার জন্য।

বনহুর যানটির ভিতরে প্রবেশ করতেই সিঁড়িটা গুটিয়ে যানের ভিতরে এলো এবং দরজা বন্ধ হয়ে গেলো। যে পানি যানের ভিতরে প্রবেশ করেছিলো তা বেরিয়ে গেলো যানের তলদেশ দিয়ে সমুদ্রগর্ভে।

বনহুর মহামূল্যবান বস্তুর বাক্সটি দস্যুরাণীর হাতে দিলো।

দস্যুরাণী করমর্দন করলো বনহুরের সঙ্গে।

এবার দস্যুরাণী আংগুল দিয়ে দেখিয়ে দিলো বনহুরকে– সম্মুখস্থ শার্শীর ফুটো দিয়ে দেখার জন্য।

বনহুর তাকিয়ে দেখলো সেই ভয়ংকর জীবটা নীরব হয়ে গেছে। তার হস্তি শূড়– দেহটা সমুদ্রগর্ভে ভাসমান বস্তুর মত জট পাকিয়ে স্থির হয়ে আছে।

দস্যুরাণীর মুখে বাইনোকুলার ফিট করা কাঁচের মুখাভরণ ছিলো। এবার দস্যুরাণী দেখতে পেলো জীবটার গোলাকার বিরাট জালার মত মাথার মাঝামাঝি চোখটার উপর একটি সূতীক্ষ্ণ ধার ছোরা বসানো রয়েছে। দস্যুরাণী অনুধাবন

করলো কেন জীবটা অমন ভাবে ছট ফট করছিলো। বনহুর তার চোখে সূতীক্ষ্ণ ধার ছোরা বিদ্ধ করায় জীবটার অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়েছিলো।

*

দস্যুরাণী বনহুরসহ ফিরে এলো সাবমেরিন নিয়ে তার প্রিয় জাহাজ রাণীতে।

দস্যুরাণীর অনুচরগণ কোনদিন রাণীকে প্রকাশ্য দেখার সুযোগ লাভ করেনি। এই জাহাজ রাণীতে এসে তারা তাদের রাণীজীকে দেখার সৌভাগ্য অর্জন করেছে।

দস্যুরাণী নিজ মুখের আবরণ উন্মোচন করে ফেলেছিলো এবার অনুচরদের সম্মুখে।

দস্যুরাণী–বনহুরকে ধন্যবাদ জানালো প্রাণভরে। নীল নদের তলদেশে বিধ্বস্ত লংলুর অভ্যন্তর হতে মহামূল্যবান সম্পদটি উদ্ধার করে আনা কম কথা নয়। বনহুর অসম্ভবকে সম্ভব করেছে।

চন্দনাসহ দিপালী এলো।

আনন্দে উচ্ছল হয়ে উঠেছে দিপালী। কঠিন একটা বিপদ যেন কেটে গেছে তার। মহামূল্যবান সামগ্রীর দিকে তার খেয়াল নেই–তার রাজকুমার যে ফিরে এসেছে এটাই পরম পাওয়া তার কাছে।

দিপালী খুশিতে আত্মহারা হয়ে রাজকুমারের কণ্ঠ বেষ্টন করে ধরে ছিলো। বুকে মাথা রেখে বলে উঠলো–আপনি ফিরে এসেছেন আমি কি যে আনন্দ উপভোগ করছি...মঙ্গল গ্রহে পাওয়া নীল মনিহার খানা দিপালী পরিয়ে দিলো বনহুরের গলায়।

বললো বনহুর–থাকনা ওটা তোমার কাছে।

বললো দিপালী–ওটা আমার কাছে মূল্যহীন হয়ে যেতো যদি আপনি ফিরে না আসতেন। ওটা আপনারই থাক রাজকুমার।

দিপালী।

বলুন রাজকুমার!

সত্যি আমি আশ্চর্য হচ্ছি ফিরে আসতে পেরেছি বলে। যমদূতের সঙ্গে আমাকে লড়াই করতে হয়েছিলো। সে কি ভয়ংকর একটা জীব। সমুদ্রগর্ভে নানা ধরণের ভীষণ আর ভয়ংকর জীব আছে কিন্তু এমন জীব আমি কোনদিন দেখিনি। মাথাটা গোলাকার একটি বিরাট আকার পাথর খন্ডের মত, ঠিক মাঝামাঝি একটি চোখ, দেহটা হস্তি শূড়ের মত কিন্তু মস্ত বড় লম্বা প্রায় পঞ্চাশ গজ হবে। ঐ জীবটাই বিধ্বস্ত লংলু উদ্ধারে যারা গেছে তাদের সবাইকে গ্রাস করেছে–আমাকেও সে গ্রাস করতে কিন্তু সৌভাগ্য বশতঃ আমি বেঁচে গেছি।

দস্যুরাণী ও তার অনুচরগণ সবাই বিস্ময় নিয়ে শুনছিলো। বললো দস্যুরানী–বনহুর জীবটার চোখে যে সূতীক্ষ্ণ ধার ছোরা বিদ্ধ অবস্থায় দেখলাম তা কি করে সম্ভব হয়েছিলো।

বনহুর ইতিমধ্যে তার শরীর থেকে ডুবুরী ড্রেস খুলে ফেলে ছিলো। সিগারেট কেস থেকে একটি সিগারেট বের করে নিয়ে মুখে গুঁজে অগ্নি সংযোগ করলো তারপর একমুখ ধোয়া ছেড়ে বললো–হস্তিশূড় যখন আমাকে বেষ্টন করে তার মুখগহ্বরের নিকটে নিয়ে এলো তখন আমি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে নিয়েছি। শেষ চেষ্টা করলাম আমার দক্ষিণ হস্তের সূতীক্ষ্ণ ধার ছোরা বসিয়ে দিলাম জীবটার চোখের মনিতে। আশ্চর্য ঘটনা, ছোরাখানা সমুখে জীবটার চোখে বিদ্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে হস্তিশূড় দেহটা শিথিল হয়ে এলো—-মুক্ত হলাম আমি। যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগলো জীবটা। আমি ততক্ষণে প্রবেশ করলাম বিধ্বস্ত লংলুর অভ্যন্তরে।

এবার দস্যুরাণী বলে উঠলো–অসংখ্য ধন্যবাদ বনহুর তুমি জয়ী হয়েছো... বনহুরের সঙ্গে করমর্দন করলো আবার রাণী।

সমস্ত জাহাজে একটা আনন্দ হিল্লোল বয়ে চলল।

দস্যুরাণী অনুচরদের মধ্যে আনন্দ উৎসব করার জন্য নির্দেশ দিলো।

মহামূল্যবান বস্তুটি এখন দস্যুরাণীর হাতের মুঠায়। এবার দস্যুরাণী আঁকা ম্যাপখানা স্বইচ্ছায় তুলে দিলো বনহুরের হাতে।

*

দস্যুরাণীর কাছে বিদায় নিয়ে ফিরে এলো বনহুর আর দিপালী কান্দাই শহরে। শহরের আস্তানায় দিপালীকে পৌঁছে দিয়ে আস্তানায় এলো বনহুর।

নূরী অভিমানে মুখ ভার করে রইলো।

এতদিন পর বনহুর ফিরে এসেছে কিন্তু কেমন যেন আনমনা ভাব তার মধ্যে।

রহমান আর অনুচর সব সময় ফিরে রয়েছে। তারা নানা কথাবার্তা আদান–প্রদান করছে। সর্দারের সঙ্গে।

দরবার কক্ষে বসে প্রথমেই শুনতে পেলো বনহুর, নূর জাভেদকে কৌশলে বন্দী করে নিয়ে গিয়েছিলো কিন্তু তাকে আটক করে রাখতে পারেনি। হাঙ্গেরী কারাগার থেকে সে পালাতে সক্ষম হয়েছে।

রহমানের মুখে সব শুনলো বনহুর।

একটা ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটে উঠলো তার ঠোঁটের কোণে। ভাবলো যেমন পিতা তেমনি তার ছেলে। হাঙ্গেরী কারাগার তাকে আটক করে রাখতে পারেনি কোনোদিন, আর তার ছেলেকে আটক রাখবে কি করে।

নূর তা হলে জাভেদকে আটক করেছিলো কি বলো রহমান?

হাঁ সর্দার।

উভয়ে উভয়ের পরিচয় জানতে পারেনি তো

না।

দেখো রহমান আমি চাইনা ওরা নিজেদের পরিচয় জানতে পারুক। জানলে অসুবিধা বাড়বে ছাড়া কমবে না।

রহমান মাথা চুলকে বললো–সর্দার, এভাবে কতদিন ওরা নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব আর কলহ নিয়ে থাকবে। নূর যখন বুঝতে পারবে জাভেদের সঙ্গে তার কি সম্বন্ধ তখন সবকিছু সমাধান হয়ে যাবে।

না রহমান, তা হয় না। আমি চাইনা ওরা নিজেদের পরিচয় জানুক। পরে সব জানাবো তোমাকে। রহমান আমার কিছুই ভালো লাগছে না তোমরা সবাই যাও। কথাগুলো বলে বনহুর উঠে পড়লো।

রহমান বললো–সর্দার, বহুদিন আপনি আস্তানা ছেড়ে ছিলেন। কান্দাই শহরে এবং কান্দাই এর আশেপাশে অনেক অনিয়ম অনাচার চলছে.....

সব পরে শুনবো রহমান।

বেরিয়ে গেলো বনহুর দরবার কক্ষ ত্যাগ করে।

রহমান এবং অনুচরগণ সবাই অবাক হলো কারণ সর্দারকে বড় আনমনা লাগছে।

নূরী প্রতীক্ষা করছিলো বনহুরের, কখন সে দরবার কক্ষ ত্যাগ করে আস্তানার অভ্যন্তরে প্রবেশ করবে। নূরীর আশা ব্যর্থ হলো, বনহুর গিয়ে বসলো ঝরণার ধারে নির্জনে।

নূরী বনহুরের জন্য উদগ্রীব ছিলো সে এসে দাঁড়ালো বনহুরের পাশে। বললো নূরীকতদিন পর ফিরে এলে কিন্তু তুমি যেন কেমন হয়ে গেছো...

বনহুর বললো–নূরী জানিনা কেন এমন হলাম। কিছু ভাল লাগছে না আমার

চলো আস্তানার ভিতরে চলো সব ভাল লাগবে।

নুরী, বারবার মনে পড়ছে মঙ্গল গ্রহের কথা। মৌ আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে যেন।

মৌ! কে সে?

মঙ্গল গ্রহের হীমা নামক সর্দার কন্যা ....

আমি কিছু বুঝতে পারছি না বনহুর। নূরী বনহুরের দিকে স্থির দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো। সে দেখতে পেলো বনহুরের চোখে মুখে একটা কেমন যেন আনমনা ভাব।

নূরী বললো–মঙ্গল গ্রহ! মঙ্গল গ্রহের কন্যাকে তুমি জানলে কি করে।

বনহুরের ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠলো একটা দীপ্ত ভাব।

নূরী বললো–চলো বনহুর ভিতরে চলো। হাত ধরে বনহুরকে তুলে নিলো নূরী তারপর আস্তানার অভ্যন্তরে নিয়ে চললো।

বিশ্রাম কক্ষে এসে বনহুরকে বসিয়ে দিলো নূরী তার শয্যার উপরে। জামাটার বোতাম ঠিকভাবে লাগিয়ে দিতে গিয়ে চমকে উঠলো নুরী। বনহুরের গলায় সেই নীল পাথর যুক্ত হার ছড়া নজরে পড়লো তার।

এমন পাথর নূরী কোনোদিন দেখেনি।

ফুল্লরার গলায় আছে নীলমনি হার কিন্তু এমন দীপ্ত নয়। তাছাড়া বহু হীরার হার রয়েছে। তাদের আস্তানার ধন ভারে সব যেন নিষ্প্রভ এই হারের কাছে।

বনহুর হেসে বললো–মঙ্গল গ্রহের মহারাজ দিয়েছেন।

মঙ্গল গ্রহের মহারাজ কে তিনি? আর মৌ বা কে?

বললাম তো হীমা কন্যা মঙ্গল গ্রহের এক তরুণী....আর মহারাজ মঙ্গল গ্রহের রাজা....

তুমি তা হলে...

হাঁ আমি মঙ্গল গ্রহে গিয়েছিলাম নূরী।

সত্যি বলছো?

তুমি তো জানো আমি কোনোদিন মিথ্যা বলি না।

হুর মঙ্গল গ্রহে তুমি কি করে গিয়েছিলো।

সে অনেক কথা। একবার নয়, দুবার আমি মঙ্গল গ্রহে যেতে সক্ষম হয়েছি। নূরী, আজ আমি সব তোমাকে বলবো।

নূরী বসে পড়লো স্বামীর পাশে।

বনহুর নূরীর কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়লো বলতে শুরু করলো সে, কি ভাবে মঙ্গল গ্রহে গিয়েছিলো তারা। সেখানে কেমন ভাবে ছিলো, কেমন সে দেশ, সেখানে মানুষ কেমন সব বললো বনহুর আগ্রহ নিয়ে এমন কি হীমা কন্যা মৌ আর রাজকন্যা রীর কথাও বলতে ভুললো না বনহুর। সংক্ষেপে সব কথাই বলে গেলে এমন কি ফিরে এলো কিভাবে তাও ব্যক্ত করলো সে।

সব শুনে অবাক হলো নূরী।

মৌ-এর জন্য দুঃখ হলো, নির্মম ভাবে হত্যা করা হয়েছিলো তাকে। চোখ দুটো অশ্রু সিক্ত হলো নূরীর।

মঙ্গল গ্রহের অনেক কিছুই জানতে পারলো নূরী যা সে কোনোদিন শোনেনি। মঙ্গল গ্রহের রাজকন্যা মৌ-এর দেওয়া নীল পাথর যুক্ত হারখানা নূরী নেড়ে দেখলো, এমন হার পৃথিবীর কেউ দেখেনি।

নূরী যখন হারোনা বিপুল আগ্রহ নিয়ে দেখছিলো তখন বনহুর ভাবছিলো মৌ-এর কথা। ঐ হারের সঙ্গে যেন মৌ-এর সংযোগ রয়েছে।

বনহুর হারখানা খুলে পরিয়ে দিলো নূরীর গলায়।

নূরী খুশিতে উচ্ছল হলো।

স্বামীর কণ্ঠ বেষ্টন করে তার ওষ্ঠদ্বয় চুম্বনে চুম্বনে ভরিয়ে দিলো।

বনহুর মৃদু হাসলো।

*

গভীর রাতে ঘুম ভেঙে গেলো বনহুরের।

চোখ মেললো সে, দেখলো শিয়রে দাঁড়িয়ে মৌ। উজ্জ্বল এক দীপ্তময় আলোকে ভরে গেছে। গোটা গুহা। শুভ্র বসনে সজ্জিত, রেশমী সোনালী চুল বাতাসে উড়ছে। দুচোখে মায়াময় চাহনী ইংগিতে ডাকলো মৌ বনহুরকে।

বনহুর তাকিয়ে দেখলো পাশে নূরী ঘুমিয়ে আছে। দক্ষিণ হাতখানা তার বনহুরের বুকের উপর রয়েছে।

ওর হাতখানা বনহুর ধীরে ধীরে সরিয়ে রেখে শয্যার উঠে বসলো। দৃষ্টি ফেরালো বনহুর শিয়রে। মৌ তেমনি দাঁড়িয়ে আছে, মুখে মৃদু হাসির আভাস। বনহুর তাকাতেই হাতছানি দিয়ে ডাকলো–এসো।

বনহুর শয্যা ত্যাগ করে মেঝেতে নেমে দাঁড়াতে গুহামুখের দিকে এগুলো মৌ।

বনহুর ওকে অনুসরণ করলো।

গুহামুখ পেরিয়ে মৌ এগিয়ে চললো।

বনহুর চলেছে ওর পিছু পিছু।

নূরীর ঘুম ভেঙে গেলো, সেও শয্যা ত্যাগ করে বনহুরকে অনুসরণ করলো এমনভাবে কোথায় চলেছে সে।

কিছু এগুতেই নূরী ডাকলো–কোথায় যাচ্ছো তুমি!

চমকে তাকালো বনহুর, বললো–মৌ আমাকে ডাকছে।

মৌ! কোথায় মৌ?

ঐ যে……বনহুর তাকালো সম্মুখে, কিন্তু পরক্ষণেই বলে উঠলো– মৌ কোথায় গেলো?

হুর তুমি কি পাগল হয়েছ, মৌ এখানে আসবে কি করে? তোমার আস্তানার প্রবেশ পথ রুদ্ধ তা ছাড়া মৌ তো মৃত্যুবরণ করেছে।

নূরী স্পষ্ট দেখলাম মৌ আমার শিয়রে দাঁড়িয়ে আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। আমি স্পষ্ট দেখেছি সে এসেছিলো…

ওসব তোমার খেয়াল।

না, আমি জেগেই দেখেছি তাকে।

চলো ঘুমাবে চলল। হুর, বহুদিন আস্তানা ছেড়ে ছিলে তাই তুমি বড় ক্লান্ত। নূরী বনহুরের হাত ধরে নিয়ে চলে শয্যায়।

বনহুরের মাথাটা নিজের কোলে তুলে নিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে থাকে নূরী। বলে সে–ঘুমাও লক্ষীটি, সব ভাল হয়ে যাবে। জানো তোমার জাভেদ এখন অনেক বড় হয়েছে।

শুনলাম রহমানের মুখে। বললো বনহুর।

নূরী বললো–ফুল্লরা বড় হয়েছে।

ওকে লক্ষ্য করিনি। কেমন আছে ফুল্লরা?

ভাল আছে।

বেশ বড় হয়েছে ও, তাইনা?

হা বড় হয়েছে আরও সুন্দর হয়েছে সে। জানো সে ভালবাসে জাভেদকে ….

বলেছিলে মনে আছে।

তবে এবার ওদের বিয়েটা…..

বেশ তো ভাল কথা বিয়েটা করিয়ে দাও।

তুমি আছো বুঝিয়ে বলোনা জাভেদকে।

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে পড়লো বনহুর।

নূরী বুঝতে পারলো বনহুর জাভেদের কথায় রাগান্বিত হয়েছে। তবু বললো সে–জানোতো ও কারো কথা শুনতে চায় না।

জাভেদকে আমি কোনো কথা বলতে চাই না।

তুমি তার পিতা।

নূরী, জাভেদকে দেখিনি অনেক দিন। কেমন আছে ও?

তোমার ছেলে কেমন আছে–আমাকে জিজ্ঞেস করছো? বললো নূরী।

বনহুর বললো–রহমানের মুখে সব শুনলাম, জাভেদ নূরকে পরাজিত করেছে। হাঙ্গেরী কারাগার থেকে সে পালাতে সক্ষম হয়েছে।

তুমি কি চাও জাভেদ হাঙ্গেরী কারাগারে বন্দী থাকুক?

না, তা চাইনা।

তবে ওর কথায় তুমি গম্ভীর হলে কেন?

কথাটা মোড় ঘুরাবার জন্য বললো বনহুর–নীলনদের তলদেশে আমাকে যেতে হয়েছিলো নূরী। অদ্ভুত এক জীবেনর সঙ্গে আমাকে লড়তে হয়েছিলো।

হুর, নীলনদের তলদেশে তুমি গিয়েছিলে?

বাধ্য হয়েছিলাম।

সে তো ভয়ংকর সাগর

হাঁ ভয়ংকরই বটে। নূরী সে এক বিস্ময়কর কাহিনী। মঙ্গল গ্রহ থেকে একেবারে দস্যুরাণীর কবলে

বল কি হুর?

হাঁ নূরী।

সত্যি আমার মন বলছিলো তুমি বড় বিপদে আছে।

কথাটা মিথ্যা নয় নূরী। নীলনদের তলদেশে এক অদ্ভুত জীবনের সঙ্গে আমাকে ভীষণ যুদ্ধ করতে হয়েছিলো.....সমস্ত ঘটনাটা খুলে বললো বনহুর নূরীর কাছে।

সব শুনে নূরীর মুখমন্ডল বিবর্ণ হলো। তার মনের আকাশে ভেসে উঠলো একটা ভয়ংকর প্রতিচ্ছবি। তার হুর ফিরে আসতে সক্ষম হয়েছে এটাই সবচেয়ে

আনন্দের কথা।

নূরী স্বামীর বুকে মাথা রাখলো আবেগে। কতদিন পর নূরী তার হুরকে নিবিড়ভাবে পাশে পেয়েছে। খুশিতে উচ্ছল নূরী।

এমন সময় শোনা যায় অশ্বপদ শব্দ।

নূরী সজাগ হয়ে উঠলো।

বনহুর বললো–কার অশ্ব পদশব্দ শোনা যায়?

বললো নুরী–এ অশ্ব পদশব্দ জাভেদের।

জাভেদ কোথায় গিয়েছিলো?

মনে হয় আশার ওখানে।

আশা সুস্থ ভাবে ফিরে এসেছে তো?

হাঁ সে এখন সুস্থ। সব কিছু দেখতে পায়।

নূরী আশার জন্য বড় চিন্তায় ছিলাম... কথাটা বলে একটা নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। বনহুরের চোখে মুখে ফুটে উঠে একটা আনন্দ দীপ্ত ভাব। বনহুর মুখে প্রকাশ না করলেও অন্তরে তার একটা দুশ্চিন্তা কাটার মত ঘ ঘছ করছিলো। আশার সংবাদ সে জানে না, না জানি সে কেমন আছে; ঠিকমত ফিরে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব হয়েছে কি না কে জানে। এই মুহূর্তে নূরীর মুখে আশার সংবাদ জানতে পেরে খুব খুশি হলো বনহুর।

নূরী বললো–জাভেদ এসে গেছে, ওকে ডাকবো?

না, এখানে ডেকে কোনো ফল হবে না। দরবার কক্ষে ওর সঙ্গে আমার কথা আছে।

শোন হুর, জাভেদকে তুমি সব সময় অবহেলা করো এটা মোটেই সমুচিত নয়।

কে বললো আমি জাভেদকে অবহেলা করি?

আমি জানি তুমি ওকে ভাল নজরে দেখো না।

নূরী, আমার কাছে নিজের সন্তান বলে কোনো ক্ষমা নেই। অপরাধ করলে তাকে উপযুক্ত শাস্তি পেতেই হবে, সে যেই হোক।

এমন সময় জাভেদ এসে দাঁড়ালো বনহুরের বিশ্রাম কক্ষের সম্মুখে। বললো, আসতে পারি।

বনহুর বললো–দরবার কক্ষে আমি তোমার সঙ্গে দেখা করবো।

জাভেদ কোনো কথা না বলে চলে গেল সেখান থেকে।

তক্ষুণি সে অশ্ব–পৃষ্ঠে চেপে বসার জন্য প্রস্তুতি নিলো এমন সময় রহমান এসে দাঁড়ালো তার পাশে। বললো রহমান–জাভেদ, তুমি যেও না।

ফিরে তাকিয়ে বললো জাভেদ–বাপু আমার সঙ্গে দেখা করলো না তাই আমি চলে যাচ্ছি।

তুমি ভাল করছো না জাভেদ।

আমি কি করছি তার কৈফিয়ত তোমাকে দিতে যাবো না রহমান চাচা, এমন কি বাপুকেও না।

জাভেদ!

চোখ রাঙিয়ে আমাকে ধমকাচ্ছো।

তোমাকে আমি শাস্তি দিতে পারি জানো!

রহমান চাচা, স্পর্ধা তোমার চরমে উঠেছে। আমি তোমার আচরণে মোটেই সন্তুষ্ট নই, কারণ তুমি আমাকে ঐ গোয়েন্দা ছোকরা নূরের সম্মুখে অপমান করেছে। আমি সেদিন ওকে খতম করতাম, ও ফুল্লরাকে অপমান করেছিলো।

রহমান বললো–জাভেদ, আমি ভাবতে পারিনি তুমি এভাবে আমার মুখের উপর কথা বলবে...রহমান ক্রুদ্ধভাবে জাভেদের গালে একটি চড় বসিয়ে দিলো।

সঙ্গে সঙ্গে সিংহ শাবকের মত গর্জে উঠলো জাভেদ এবং প্রচন্ড এক ঘুষি বসিয়ে দিলো রহমানের নাকের উপর।

ঠিক ঐ মুহূর্তে অনেকগুলো অনুচর এসে দাঁড়িয়েছিলো তারা জাভেদকে ঘিরে দাঁড়ালো।

জাভেদ সবার দিকে তাকিয়ে কঠিন কণ্ঠে বললো—-সরে যাও, না হলে আমি হত্যা করবো তোমাদের সবাইকে।

অনুচরগণ কেউ সরলো না বরং তারা জাভেদকে আক্রমণ করার জন্য রহমানের মুখের দিকে তাকালো।

রহমান বাধা দিলো সবাইকে।

তারপর চলে গেলো রহমান সেখান থেকে। দুচোখ তার ছল ছল করে উঠলো যে জাভেদকে রহমান প্রাণ অপেক্ষা ভালবাসে সেই জাভেদ কিনা তাকে…রহমান একেবারে সবার দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলো।

জাভেদ ততক্ষণে অশ্বপৃষ্ঠে চেপে উল্কাবেগে নিরুদ্দেশ হলো।

অনুচরদের মধ্য হতে দুজন চলে গেলো এবং সমস্ত কথা বনহুরকে বললো!

বনহুর কথাটা শুনে ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো। জাভেদ রহমানকে আঘাত করেছে, এতো বড় সাহস হলো তার। ক্ষিপ্তের মত উঠে দাঁড়াল বনহুর এবং গম্ভীর কণ্ঠে আদেশ দিলো–যাও জাভেদকে আমার সম্মুখে হাজির করো।

কুর্ণিশ জানিয়ে প্রস্থান করলো বনহুরের অনুচরগণ।

বনহুর ফিরে তাকালো নূরীর দিকে।

নূরী বললো–জাভেদ এমন কাজ করবে তা ভাবতেও পারিনি।

বনহুর ভ্রুকুঞ্চিত করে বললো–স্পর্ধা ওর বেড়ে গেছে চরম ভাবে। আমি জানতাম ও আয়ত্বের বাইরে চলে যাচ্ছে দিন দিন।

নূরী বনহুরের কণ্ঠস্বরে চমকে উঠলো।

একটা ভীষণ ভীতিভাব তার মনকে উদগ্রীব করে তুললো। না জানি জাভেদের অবস্থা এখন কি দাঁড়াবে।

বললো নূরী–তুমি আমাকে বিশ্বাস করো জাভেদ বড় অবুঝ।

নূরী তুমি জাভেদ সম্বন্ধে কোন কথা বলবে না, কারণ আমি জাভেদকে জানি।

কথাটা বলে বেরিয়ে গেলো বনহুর।

দরবার কক্ষে এসে দাঁড়াতেই তার অনুচরগণ সবাই এসে হাজির হলো। সবার চোখে মুখে আতঙ্কের ছাপ ফুটে উঠেছে। সর্দারকে তারা ভাল ভাবেই চেনে। রাগলে বনহুর সিংহের চেয়ে ভয়ংকর।

অনুচরগণ মাথা নত করে দাঁড়িয়ে আছে সারিবদ্ধভাবে।

বনহুর বজ্র কঠিন কণ্ঠে বলে উঠলো–জাভেদ কোথায়?

কায়েস সম্মুখে দন্ডায়মান ছিলো, সে বললো জাভেদ গহীন জঙ্গলে প্রবেশ করেছে তাকে ফিরিয়ে আনার জন্য মংলু, রফিক, রহিম এরা গিয়েছে।

তাকে ফিরিয়ে নয় বন্দী করে নিয়ে এসো। ওর এততবড় সাহস রহমানের শরীরে আঘাত করেছে। জাভেদ জানেনা রহমান আমার শুধু অনুচর নয় সে আমার বন্ধু। কায়েস!

বলুন সর্দার।

রহমান কোথায়?

জানিনা সর্দার, তাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

জানিনা রহমান আর আসবে কিনা! কথাটা ব্যথা জড়িত কণ্ঠে বললো বনহুর।

দরবার কক্ষের দেয়ালে মশাল গুলো দপ্ দপ্ করে জ্বলছে।

জমকালো পোশাকে আচ্ছাদিত বনহুরের শরীর। কোমরের বেল্টে সূতীক্ষ্ণ ধার ছোরা আর অপর পাশে মারণাস্ত্র রিভলভার।

বনহুরের দুচোখ দিয়ে যেন আগুন টিকরে বের হচ্ছে। তার ভারী বুটের শব্দ গুহা মধ্যে অদ্ভুত প্রতিধ্বনি জাগাচ্ছিলো।

দরবার কক্ষ নিস্তব্ধ।

শুধু বনহুরের ভারী বুটের আওয়াজ ছাড়া আর কিছু শোনা যাচ্ছিলোনা। সমস্ত অনুচরবর্গের মুখ গম্ভীর। মশালের আলোতে বনহুরের দেহের পোশক টক্ টক্ করছিলো।

এমন সময় প্রায় আট দশ জন অনুচর জাভেদকে অস্ত্রদ্বারা পরিবেষ্ঠিত অবস্থায় নিয়ে এলো। বনহুরের সম্মুখে।

বনহুর থমকে দাঁড়িয়ে তাকালো জাভেদের দিকে। বহুদিন পর বনহুর জাভেদকে দেখলো। সমস্ত দেহে কোনো আবরণ নেই। মাথায় ঝাকড়া চুল, প্রশস্ত ললাট। গভীর নীল দুটো চোখ। পরনে একটি ফুল প্যান্ট। হাঁটু অবধি গুটানো রয়েছে। পায়ে বুট, হাঁটুর নীচ অবধি মজবুত ফিতা দিয়ে বাধা।

পা থেকে মাথা অবধি বনহুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে দেখে নিলো ওর। তারপর বললো–ওকে ঐ থামের সঙ্গে বেঁধে ফেলো।

সঙ্গে সঙ্গে আদেশ পালন করলো অনুচরগণ।

জাভেদ কোনো বাধা দিলোনা, সে নিশ্চুপ রইলো।

জাভেদকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করার পর মুহূর্তেই বনহুর দরবার কক্ষের দেয়াল থেকে খুলে নিলো শংকর মাছের লেজের চাবুক খানা। তারপর দাঁতে ঠোঁট কামড়ে ধরলো বনহুর, কষাঘাত করে চললো দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে।

জাভেদ তবু নির্বাক। যন্ত্রণায় মাঝে মাঝে মুখখানা বিকৃত করে ফেলছে, তবু একটু আঃ অথবা উঃ শব্দ সে মুখ দিয়ে বের করছে না।

পিঠের চামড়া কেটে রক্ত গড়িয়ে পড়লো।

শংকর মাছের লেজের কষাঘাত শুধু সাংঘাতিক নয় ভয়ংকর। জাভেদের দেহ হতে তাজা লাল টক টকে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে।

তবু বনহুর আঘাতের পর আঘাত করে চলেছে। তার চোখে মুখে হত্যার নেশা চেপে বসেছে যেন। একটুও শিথিল হচ্ছে না তার হাতখানা।

অনুচরগণ চোখ ফিরিয়ে নিয়েছে। তারা এ দৃশ্য সহ্য করতে পারছে না। সর্দারকে তারা কঠিন হতে দেখেছেন কিন্তু এমন ভীষণ ভাবে নিজ সন্তানের প্রতি ভয়ংকর হতে দেখেনি।

কায়েস একবার দুহাত প্রসারিত করে এগিয়ে যাবার জন্য পা বাড়ালো কিন্তু অগ্রসর হতে পারলো না। সাহসে কুলালোনা তার।

আড়াল থেকে ফুল্লরা সব দেখলো, সে ছুটে গেলো নূরীর কাছে। চলো আম্মু, জাভেদকে সর্দার মেরে ফেললো। ওকে বাঁচাও।

ফুল্লরার কথা শুনে ভীষণভাবে চমকে উঠলো নূরী। সে জানতো জাভেদকে অনুচররা খুঁজে ফিরছে কিন্তু তাকে পাওয়া যায়নি।

এখন জানতে পেরে নূরীর মন অস্থির হয়ে উঠলো কিন্তু সে দরবার কক্ষে যেতে সাহস পেলো না। কারণ নূরী জানে বনহুরকে সে রুখতে পারবে না।

ফুল্লরা কেঁদে উঠলো, নূরীর হাত দুখানা চেপে ধরে বললো যাও আম্মু আর একদন্ড বিলম্ব করো না। যাও……

নূরী বললো–না আমি যাবো না ফুল্লরা। ওকে মেরে ফেলুক। বড় অবাধ্য ও। ওকে মেরে ফেলুক।

না-না তা হয় না। তুমি যাও আম্মু… তোমার পায়ে পড়ি তুমি যাও।

ফুল্লরা মুখে যেতে বললেও তার মন জানে কেউ গেলে সর্দার তার কথা মানবে না। এবার নয় আরও একবার সর্দার ওকে নির্মমভাবে শাস্তি দিয়েছিলো।

ফুল্লরা দুহাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে থাকে। জাভেদ ওকে ভাল না বাসলেও ফুল্লরা ওকে ভালবাসে। গভীরভাবে ভালবাসে সে জাভেদকে। ফুল্লরা জানতোনা জাভেদকে সর্দার বন্দী করে প্রহার করছে।

আপন মনে ঘুরে বেড়াচ্ছিলো ফুল্লরা ঠিক সেই সময় একজন অনুচর এসে ফুল্লরাকে বলে, যাও দেখোগে জাভেদকে সর্দার ভীষণভাবে শাস্তি দিচ্ছে। তুমি যাও যদি রক্ষা করতে পারো।

ফুল্লরা কথাটা শুনে দৌড়ে গিয়েছিলো দরবার কক্ষে কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করার সাহস পায়নি। দরজায় দাঁড়িয়ে যে দৃশ্য ফুল্লরা দেখেছিলো তা অতি ভয়ংকর। সর্দারের এ মূর্তি সে কোনোদিন দেখেনি। ঘাবড়ে গিয়েছিলো ফুল্লরা, ছুটে এসেছিলো নূরীর কাছে।

কিন্তু নূরীও নীরব রইলো।

ফুল্লরা বিমুখ হয়ে ফিরে গেলো নিজের কক্ষে, বিছানায় লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে লাগলো সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে।

ওদিকে বনহুর নির্মমভাবে আঘাতের পর আঘাত করে চলেছে।

সমস্ত দেহ জাভেদের রক্তাক্ত হয়ে পড়েছে।

কায়েস এ দৃশ্য সহ্য করতে পারে না। দুহাতে জড়িয়ে ধরে বনহুরকে–সর্দার... মরে গেলো...

সরে যাও কায়েস–ওকে আমি হত্যা করবো। ও জানে না ওর অপরাধ কতখানি। রহমান আমার কে তা ও জানেনা...

কথার সঙ্গে সঙ্গে আঘাত করলে বনহুর জাভেদের দেহে।

জাভেদের দেহটা নেতিয়ে পড়লো।

সংজ্ঞা হারিয়ে ফেললো জাভেদ।

পুনরায় বনহুর আঘাত করতে গেলো–জাভেদের দেহে ঠিক ঐ মুহূর্তে কোথা হতে উম্মাদের মত ছুটে এলো রহমান। এক হাত তার নেই শুধু দক্ষিণ হাতখানা দিয়ে জড়িয়ে ধরলো জাভেদের সংজ্ঞাহীন দেহটা।

তারপর ছুটে এসে বনহুরকে জাপটে ধরলো–সর্দার ওকে মাফ করে দিন। সর্দার মাফ করে

রহমান যে তোমার দেহে আঘাত করেছে আমি তাকে ক্ষমা করবো না।

সর্দার।

রহমান তুমি ওকে

সর্দার আমি আত্মহত্যা করবো, নইলে ওকে মুক্ত করে দিন। ওকে মুক্ত করে দিন।

... রহমান বনহুরের হাতখানা চাবুকসহ চেপে ধরলো।

বনহুরের দৃষ্টি–ফিরে এলো রহমানের মুখে। খানিকক্ষণ সে রহমানের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে চারখানা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দরবার কক্ষ ত্যাগ করলো।

রহমান জাপটে ধরলো জাভেদকে, অন্যান্য অনুচরগণ তাড়াতাড়ি এসে জাভেদের বন্ধন মুক্ত করে দিয়ে নামিয়ে নিলো নিচে। শুইয়ে দিলো গুহার মেঝেতে।

জাভেদের সংজ্ঞা ছিলোনা।

তার সমস্ত দেহ রক্তাক্ত।

রহমান জাভেদের মাথাটা কোলে তুলে নিলো। মুখে বুকে হাত বুলিয়ে বললো–ওরে তোর এ অবস্থা হবে আমি ভাবতে পারিনি।

জাভেদকে দুতিন জন মিলে তুলে নিলো তারপর তাকে নিয়ে গেলো আস্তানার অভ্যন্তরে।

নূরী সন্তানের অবস্থা দেখে আর্তনাদ করে উঠলো। ছুটে গেলো সে বনহুরের পাশে, দুহাতে তার জামাটা টেনে ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললো–নিষ্ঠুর, এ তুমি কি করেছে? জাভেদকে তুমি হত্যা করেছে....ও তোমার সন্তান নয়?

আমি ঠিকই করেছি। ওর উপযুক্ত শাস্তি আমি ওকে দিয়েছি।

কি এমন অপরাধ করেছিলো যে কারণে তুমি ওকে ক্ষমা করতে পারলে না?

ক্ষমা! তুমি কি আজ নতুন আবিষ্কার করলে আমাকে নূরী? বনহুর অপরাধীকে ক্ষমা করতে জানেনা সে যেই হোক।

নিজের সন্তান বলে একটু মায়া হলো না তোমার?

মায়া! হাঃ হাঃ হাঃ..... হাঃ হাঃ হাঃ..... বনহুর অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো।

নূরী অবাক না হলেও হতভম্ব হলো কারণ বনহুরকে এমন করে সে বহুদিন হাসতে দেখলেও আজ যেন তার মধ্যে নতুন এক রূপ দেখতে পেলো। বড় কঠিন মনে হলো তাকে আজ।

কোন কথা বলতে সাহস পেলো না নূরী। নিশ্চুপ সরে দাঁড়ালো এক পাশে।

বনহুর বেরিয়ে গেলো।

নূরী ছুটলো জাভেদের গুহায়।

গিয়ে দেখলো ফুল্লরা নিজের আঁচল দিয়ে জাভেদের মুখ চোখ এবং দেহের রক্তে মুছে দিচ্ছে। দুচোখ দিয়ে ঝর ঝর করে গড়িয়ে পড়ছে অশ্রুধারা।

নূরী এসে পাশে বসে দুহাতে মাথাটা কোলে তুলে নিয়ে ব্যাকুল কণ্ঠে ডাকলো– জাভেদ–বাবা জাভেদ একবার চোখ মেলে দেখ বাপ।

কিন্তু জাভেদ তখন সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ছিলো, সে কিছু শুনতে পাচ্ছে না।

অন্যান্য অনুচরগণ কেউ বাতাস করছে পাখা দিয়ে, কেউ চোখে মুখে পানির ছিটা দিচ্ছে, সবাই ভীষণ ব্যস্ত সমস্ত হয়ে পড়েছে। এমন সময় রহমান ডাক্তার নিয়ে এলো তাকে ব্যাকুল কণ্ঠে বললো ডাক্তার ওকে দেখো। যা ঔষধ লাগে দাও। ওকে ভাল করে দাও ডাক্তার।

ডাক্তার অনুচরদেরই একজন। সে তার সাধ্যমত চিকিৎসা করতে লাগলো! ঔষধ–পত্র যা প্রয়োজন আঘাতের জায়গায় প্রলেপ দিতে লাগলো।

সেদিন জাভেদের সংজ্ঞা আর ফিরে এলো না। সমস্ত দিন জাভেদকে নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত রইলো বনহুরের অনুচরগণ।

রহমান তো উদ্রান্তের মত ছুটোছুটি করছে। সে জানে সর্দার কত বড় কঠিন, তার হাতের চাবুকের আঘাত শুধু সাংঘাতিক নয়–ভীষণ। জাভেদের সংজ্ঞা আর ফিরে আসবে কি না কে জানে। নিজের প্রতি রহমানের রাগ হচ্ছিলো, কেননা সে জাভেদের আচরণে অসন্তুষ্ট হয়েছিলো। না হলে এখন এমন অবস্থা হতোনা।

নিজেকে বড় অপরাধী মনে হচ্ছিলো তার।

গভীর রাতে যখন জাভেদের গুহায় কেউ ছিলোনা তখন ফুল্লরা এলো চুপি চুপি পা টিপে টিপে। জাভেদ তখন অজ্ঞান অবস্থায় রয়েছে।

ফুল্লরা এসে দাঁড়ালো শিয়রে।

মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো ফুল্লরা ধীরে ধীরে।

হঠাৎ জাভেদ পাশ ফিরলো, মুখ দিয়ে শব্দ করলো–উঃ–উঃ পানি দাও..... পানি....

ফুল্লরা তাড়াতাড়ি পানির পাত্র থেকে পানি নিয়ে জাভেদের মুখে ঢেলে দিলো তারপর আঁচলে ওর মুখটা মুছে দিলো যত্ন সহকারে।

চোখ মেললো জাভেদ।

মশালের আলোতে জাভেদ দেখলো ফুল্লরা অশ্রুসিক্ত নয়নে তাকিয়ে আছে তার মুখের দিকে।

জাভেদ বললো–আমার কি হয়েছে ফুল্লরা?

ফুল্লরা পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে বললো–কিছু না। তোমার কিছু হয়নি।

মিথ্যে কথা, আমার সব মনে পড়েছে। কথাটা বলে জাভেদ শয্যায় উঠে বসলো।

ফুল্লরা বললো–তুমি শুয়ে থাকো জাভেদ। শুয়ে থাকো, এখন উঠোনা।

জাভেদ মুহূর্ত বিলম্ব না করে শয্যা ত্যাগ করলো তারপর বেরিয়ে যাবার জন্য দরজার দিকে পা বাড়ালো।

ফুল্লরা পথ আগলে দাঁড়িয়ে বললো–না না তোমার যাওয়া হবে না। জাভেদ– তুমি বড় অসুস্থ।

জাভেদ কোনো কথাই শুনলো না, সে ফুল্লরাকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়ে চলে গেলো।

ফুল্লরা চিৎকার করে ডাকলো–জাভেদ–তুমি যেওনা–যেওনা বলছি.... ছুটে এলো অনুচরগণ।

রহমান ব্যস্ত হয়ে এসে তাকালো চারপাশে। জাভেদকে না দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লো।

নূরীও এসে দাঁড়িয়েছে।

বললো নূরী–জাভেদ কোথায়? আমার নয়ন মনি কোথায়? কোথায় গেলো আমার জাভেদ.....

ফুল্লরা কাঁদতে কাঁদতে বললো–ঐ–ঐ দিকে চলে গেছে সে। সংজ্ঞা ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে শয্যা ত্যাগ করে চলে গেলো।

আমি বাধা দিতে গেলাম কিন্তু সে আমাকে সরিয়ে দিয়ে চলে গেলো....

ঠিক ঐ সময় আস্তানার বাইরে শোনা গেলো অশ্বখুরের শব্দ।

ফুল্লরা বলে উঠলো–ঐ তো জাভেদ চলে যাচ্ছে। ওর ঘোড়ার খুরের শব্দ শোনা যাচ্ছে।

নূরী আর অন্যান্য সবাই ছুটে গেলো কিন্তু জাভেদ ততক্ষণে চলে গেছে। তার অশ্ব খুরের শব্দ ছাড়া আর কিছু তারা শুনতে পাচ্ছে না।

দুহাতে মুখ ঢেকে কেঁদে উঠলো নূরী।

ফুল্লরার গন্ড বেড়ে গড়িয়ে পড়লো অশ্রুধারা।

রহমান ললাটে আঘাত করলো।

অন্যান্য অনুচরদের মুখমন্ডল মলিন বিবর্ণ হলো।

না জানি জাভেদ কোথায় চলে গেলো। ওর শরীর ভীষণ অসুস্থ। সংজ্ঞা ছিলোনা, সবে তার সংজ্ঞা ফিরে এসেছে। এমত অবস্থায় কোথায় গেলো জাভেদ।

জাভোদ তার অশ্ব নিয়ে চলে এলো দূরে–বহুদূরে। কান্দাই ত্যাগ করে অনেক–অনেক দূরে। সে আর বাপুর সম্মুখে যাবে না কোনোদিন। এ মুখ সে আর দেখাবে না। এমন কি আশা আম্মুর কাছেও সে গেলোনা।

জম্বুর পর্বতের পাদমূলে এসে অশ্ব থেকে নেমে পড়লো। গোটা রাত এবং গোটা একটা দিন অবিরাম অশ্ব ছুটিয়ে এসেছে জাভেদ। তার দেহ অবসন্ন, মাথা ঝিম ঝিম করছে। সমস্ত শরীরে রক্তের ছাপ, ক্ষত বিক্ষত দেহ। একটা গাছের পাশে অশ্ব রেখে গাছের তলে শুয়ে পড়লো জাভেদ।

মনে পড়ছে সব কথা।

বাপুর চেয়ে বেশি রাগ হচ্ছে রহমান চাচার উপর। রহমান চাচার জন্যই তাকে এমনভাবে চাবুকের আঘাত সহ্য করতে হলো। রাগ অভিমান তাকে ভীষণভাবে বিচলিত করলো। কিন্তু বেশিক্ষণ ভাবার সময় হলো না এক সময় ঘুমিয়ে পড়লো জাভেদ।

যখন ঘুম ভাঙলো তখন জাভেদ দেখলো তার ঠিক শিয়রে দাঁড়িয়ে আছে তার অশ্ব। বেলা তখন ঠিক মাথার উপরে। জাভেদ বুঝতে পারলো গোটা একটা রাত এবং একটা দিন সে ঘুমিয়েছে। পরদিন সে অনেক বেলায় জেগে উঠেছে। তাকে পাহারা দিয়েছে তার অশ্বটি।

জাভেদ উঠে দাঁড়ালো ক্ষুধা পিপাসায় তার পেটের নাড়ি ভুড়ি হজম হবার জোগাড়। শরীরের ব্যথা আজ অনেক কমে এসেছে।

আস্তানায় তার দেহের ক্ষতগুলিতে ঔষধ মাখিয়ে দেওয়া হয়েছিলো, হয়তো সে কারণেও

জাভেদ চারদিকে তাকিয়ে দেখলো।

এখানে সে সম্পূর্ণ একা তার অশ্ব ছাড়া। জাভেদ অশ্বের পাশে এসে ওর পিঠ চাপড়ে দিয়ে আদর করলো।

অশ্ব একটু শব্দ করলো–চিহিং চিহিং।

জাভেদ ধীরে ধীরে অগ্রসর হলো, কোথাও পানি পাওয়া যায় কিনা। বড় পিপাসা বোধ করছে সে।

বহুদূর এগিয়েও কোনো জলাশয় পেলো না জাভেদ। বিষণ্ন মনে ফিরে চললো সে তার অশ্বপিঠের পাশে। হঠাৎ নজরে পড়লো গহীন জঙ্গলের মধ্যে একটি পর্ণকুঠির।

জাভেদ অশ্বের কাছে ফিরে এলো তারপর অশ্বের লাগাম ধরে এগিয়ে চললো সেই পর্ণকুঠির লক্ষ্য করে।

বেশ কিছুক্ষণ চলার পর জাভেদ–পৌঁছে গেলো সেই পর্ণ কুঠিরের পাশে।

জাভেদ অশ্বসহ কুঠিরের সম্মুখে এসে দাঁড়ালো। দেখলো একটি সন্ন্যাসী সমস্ত শরীরে ভস্ম মাখা–বসে আছে উঠানের মাঝখানে, দুচোখ মুদিত তার।

জাভেদ অবাক হলো।

গহীন জঙ্গলে মানুষ, তা সন্ন্যাসী বটে....পানি চাইবো কি ওর কাছে, কিন্তু সন্ন্যাসী পানি পাবে কোথায়?

জাভেদ পিপাসায় ভীষণ কাতর।

বারবার সে ওষ্ঠদ্বয় জিভ দিয়ে ভিজিয়ে নেবার চেষ্টা করছিলো।

এমন সময় চোখ মেললো সন্ন্যাসী।

হাতের ইশারায় জাভেদকে ডাকলো সে পাশে।

জাভেদ এগিয়ে এলো অশ্ব রেখে।

সন্ন্যাসী বললো–বসো।

জাভেদ বসলো।

সন্ন্যাসী এবার কুঠিরের দিকে তাকিয়ে বললো–হুমায়রা, পিপাসার্ত অতিথিকে পানি দাও।

চমকে উঠলো জাভেদ সে পিপাসার্ত এ কথা সন্ন্যাসী জানলে কি করে। সে তাকালো কুঠিরের দিকে।

দেখলো একটি তরুণী হাতে মাটির পান পাত্র নিয়ে এগিয়ে আসছে। ওর পরনে হরিণের চামড়া, বুকে হরিণের চামড়ার বেষ্টনী। পাশে হাতে গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। চুলগুলো মাথার উপর কুটি করে বাধা।

হুমায়রা মাটির পান পাত্রে সচ্ছ–ঠান্ডা পানি নিয়ে হাজির হলো।

অবাক হলো জাভেদ।

কিন্তু বেশিক্ষণ ভাবার সময় তার নেই, তাড়াতাড়ি পাত্র হাতে নিয়ে এক নিঃশ্বাসে পান করলো জাভেদ।

শূন্য পাত্র হাতে নিয়ে তাকালো জাভেদ ওর দিকে।

হাত বাড়ালে হুমায়রা।

সন্ন্যাসী বললো–মা হুমায়রা, তুমি অতিথির জন্য শয্যার ব্যবস্থা করে অতিথি বড় বিপদ গ্রস্ত।

হুমায়রা মাটির পাত্রটি নিয়ে চলে গেলো।

জাভেদ–অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। ভাবছে কি করে সন্ন্যাসী তার সবকিছু জানতে পেরেছে। সে তো কোনো কথা বলেনি।

জাভেদ যখন ভাবছিলো তখন সন্ন্যাসী বললো–কিছু ভেবোনা সব ঠিক হয়ে যাবে।

অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো জাভেদ সন্ন্যাসীর মুখের দিকে।

হেসে বললো সন্ন্যাসী–তুমি অবাক হয়েছে আমার কথা শুনে। ভাবছো আমি কি করে সব জানতে পারলাম?

জাভেদ নির্বাক, এখন পর্যন্ত সে কোনো কথা বলেনি। সন্ন্যাসী যা বলছে তাই সে শুনে যাচ্ছে। আশ্চর্য সন্ন্যাসী তাকে এত শীঘ্র আপন করে নিয়েছে।

পানি পান করার পর জাভেদ নিজেকে সুস্থ মনে করছে। ধীরে ধীরে ক্লান্তি অবসাদ দূর হয়ে আসছে। শরীরের ব্যথা ক্রমান্বয়ে কমে আসছে তার।

হুমায়রা এসে দাঁড়ালো, বললো সে–অতিথির শয্যা তৈরি করা হয়েছে।

সন্ন্যাসী বললো–যাও বৎস তোমার শয্যা তৈরি।

জাভেদ অবাক হলো।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় ভাবে তাকিয়ে রইলো শুধু।

হুমায়রা বললো–এসো।

এবার জাভেদ না উঠে পারলো না, সে হুমায়রার সঙ্গে এগুলো।

সন্ন্যাসী পুনরায় চোখ মুদিত করলো।

কুঠিরে প্রবেশ করে জাভেদ তাকালো, মেঝের ঠিক মাঝামাঝি সুন্দর ভাবে একটি খেজুর পাতার বিছানা রয়েছে।

হুমায়রা আংগুল দিয়ে বিছানা দেখিয়ে দিয়ে বললো–যাও শুয়ে পড়ো।

জাভেদ শুয়ে পড়লো।

বড় ক্লান্ত অবসন্ন তার শরীর।

শোবার সঙ্গে সঙ্গে চোখ দুটো তার বন্ধ হয়ে এলো। ঘুমিয়ে পড়লো জাভেদ।

যখন তার ঘুম ভাঙলো তখন সে দেখলো সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেছে। শরীরের ব্যথা একটুও অনুভব করছে না। প্রফুল্ল লাগছে মনটা তার। শয্যায় উঠে বসার সঙ্গে

সঙ্গে তার দৃষ্টি পড়লো হুমায়রার প্রতি।

হেসে বললো হুমায়রা–কেমন বোধ করছো পথিক?

জাভেদ কোনো জবাব না দিয়েই বেরিয়ে এলো কুঠিরের মধ্য হতে।

বাইরে সন্ন্যাসী ঠিক ঐ জায়গায় বসে আছে দুচোখ বন্ধ করে।

জাভেদ সন্ন্যাসীর পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। ভাবছে এবার বিদায় নেওয়া যাক।

এমন সময় চোখ মেললো সন্ন্যাসী। বললো–বস–বিদায় নেবে ভাবছো কিন্তু তা হবে না। তোমাকে আমি যেতে দেবোনা। আরও অবাক হচ্ছ কেন যেতে দেবোনা। হাঁ ভাবার কথা বটে। বসো।

বসলো জাভেদ।

সন্ন্যাসী বললো–তোমার অশ্ব ঠিক ভাবেই আছে তার জন্য ভেবোনা।

জাভেদ কোন জবাব দিলোনা।

সন্ন্যাসী বললো–হুমায়রা, অতিথিকে খাবার দাও। সে বড় ক্ষুধার্ত।

হুমায়রা কিছু সময়ের মধ্যেই দুটি থালায় কিছু ফল মূল এবং খাবার নিয়ে এলো।

সম্মুখে রাখলো পিতা এবং অতিথির।

জাভেদকে লক্ষ্য করে বললো সন্ন্যাসী–নাও খেয়ে নাও বৎস।

জাভেদ এবার না খেয়ে পারলোনা।

সন্ন্যাসী এবার তরল জাতীয় একটি পানীয় পান করতে দিলো জাভেদকে।

জাভেদ বিনা দ্বিধায় পান করলো।

এরপর জাভেদ পুনরায় ঘুমিয়ে পড়লো।

যখন ঘুম ভাঙলো তখন সে ভুলে গেলো তার অতীত জীবন! কে সে এ কথাও জাভেদ বিস্মৃত হলো।

সন্ন্যাসী দেবনাথ জাভেদের নাম রাখলো–ইন্দ্রনাথ।

আসলে সন্ন্যাসী দেবনাথ সাধারণ সন্ন্যাসী নয়, সে এক জ্যোতিষী।

গণনা শাস্ত্রে তার দক্ষতা অপরিসীম। জাভেদ তার কুঠিরের দরজায় পা রাখবার পূর্বেই দেবনাথ জানতে পারে তার কুঠিরে এমন এক অতিথির আগমন ঘটেছে যার সঙ্গে তুলনা হয় না কোনো সাধারণ মানুষের বা কোনো ব্যক্তির। আরও জানতে পারে দেবনাথ, ঐ তরুণ সিংহ শাবকের চেয়েও দুর্দান্ত।

দেবনাথ তাই সমাদরে অতিথিকে অভ্যর্থনা জানালেন।

দেবনাথের কোনো সন্তান ছিলোনা। সে অবিবাহিত, কোনো নারী তার জীবনে আজও আসেনি স্ত্রী হয়ে। হুমায়রা তার এক শিষ্য কন্যা।

পিতা মাতা নিহত হয় কোনো এক যুদ্ধে। সংবাদ জানতে পারে দেবনাথ তার গণনায়। তারপর দেবনাথ সেখানে যায় এবং হুমায়রাকে নিয়ে আসে। নিজ কন্যার স্নেহে প্রতিপালন করে দেবনাথ হুমরায়রাকে। হুমায়রাকেও দেবনাথ তার দৈব্যসুধা পান করিয়ে তার অতীত জীবন থেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছে ঠিক জাভেদের মত করে।

জাভেদ এখন সম্পূর্ণ বিস্মৃত হলো তার সবকিছু। নতুন নামে তার জন্ম হলো–ইন্দ্রনাথ।

সন্ন্যাসী জানে জম্বুর পর্বতের তলদেশে কোনো গুহায় একটি মহামূল্যবান পাথর ছিলো যা সাতটি মানিকের সমতুল্য। দেবনাথ আরও জানে সে অমূল্য সম্পদ এখন জম্বুর পর্বতের তলদেশে নেই। এক জংলী সর্দার সেই অমূল্য বস্তুটির অধিকারী হয়েছিলো। তারপর সেই সম্পদ চলে গেছে কোনো এক নারীর হাতে। সব সে জানতে পারে গণনা করে।

সেই মহামূল্য সম্পদটিই লাভ করার জন্যে জ্যোতিষী সন্ন্যাসী জাভেদকে নিজের করে নিতে চেষ্টা করলো।

ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছে দেবনাথের।

ইন্দ্রনাথ নামে জাভেদ কয়েকদিনের মধ্যে সন্ন্যাসীর বাধ্য হয়ে পড়লো। ইন্দ্রনাথকে দিয়ে সে তার মূল উদ্দেশ্য সফল করতে চায়।

দেবনাথ হুমায়রার সঙ্গে ইন্দ্রনাথের ভালবাসা গড়ে উঠুক তাই সে চায়। তাই সব সময় ইন্দ্রনাথের পাশে হুমায়রাকে থাকার জন্য বলে।

সরল সহজ মেয়ে হুমায়রা কিছু বোঝেনা। সে ইন্দ্রনাথ নামী জাভেদের পাশে থেকে সব কাজে সহায়তা করে।

সন্ন্যাসী দেবনাথ কাঁচা মাংস খেতো তাই ইন্দ্রনাথকে প্রতিদিন একটি করে হরিণ শিকার করতে হতো।

দেবনাথের সঙ্গে হুমায়রা এবং ইন্দ্রনাথ উভয়েই কাঁচা মাংস এবং ফল মূল খেত। প্রথমে হুমায়রার কাছেও কাঁচা মাংস বিস্বাদ লাগতো এখন সেও অনায়াসে খায় বিনা দ্বিধায়।

সব দেখে ইন্দ্রনাথও কাঁচা মাংস খেতে শিখলো। ভুলে গেলো ইন্দ্রনাথ নামী জাভেদ তার সব কিছু।

হুমায়রা সর্বক্ষণ ইন্দ্রনাথের পাশে থাকলেও ইন্দ্রনাথের তেমন কোন লক্ষ্য নেই তার দিকে। ইন্দ্রনাথ যখন খেতে বসে তখন হুমায়রা তাকে খাবার পরিবেশন করে। সে যখন ঘুমায় তখন ও বাতাস করে। যখন শিকারে বের হয় তখন সঙ্গে থাকে হুমায়রা।

ইন্দ্রর সাথী হিসেবে হুমায়রা খুশিতে উচ্ছল। বড় ভাললাগে ওর ওকে কিন্তু ইন্দ্রর কোন ভাব বা আকর্ষণ নেই ওর প্রতি। সব কাজ সে হুমায়রাকে নিয়েই সমাধা করে এমন কি ঘোড়াতে চড়াও শেখায় ইন্দ্র ওকে। মাঝে মাঝে ওকে নিজের কোলে তুলে নিয়ে ঘোড়ায় বসিয়ে দেয়। জাভেদের ঘোড়া সে এক ভয়ংকর জীব। জাভেদ ছাড়া কেউ এ ঘোড়ায় চড়তে পারে না।

জাভেদ হুমায়রাকে সুন্দর ভাবে ঘোড়ায় চড়া শিখিয়ে নিলো।

সন্ন্যাসী ইন্দ্রকে নিয়ে মাঝে মাঝে চলে যায় দূরে, কখনও পর্বতে, কখনও গহীন বনে কখনও প্রান্তরে ঘুরে বেড়ায়। কিসের সন্ধান করে ফেরে জ্যোতিষী সন্ন্যাসী, সেই জানে। ইন্দ্র তা জানেনা।

সে প্রায়ই গহন জঙ্গলে হরিণ শিকার করতে যায়, কোনো জীব জন্তুকে সে ভয় পায় না ভয় পায়না কোন হিংস্র জীবকে।

সন্ন্যাসী মাঝে মাঝে তপস্যায় বসে।

গণনা করে কি যেন দেখে, তারপর ইন্দ্রকে ডেকে বিড় বিড় করে মন্ত্র পাঠ করে।

কিন্তু সন্ন্যাসী তার ইন্দ্রকে ধরে রাখতে পারে না। সে ভীষণ শক্তি লাভ করে এবং যা খুশি তাই করে সে। সন্ন্যাসী জ্যোতিষীর অজ্ঞাতে ইন্দ্র নামি জাভেদ চলে যায় দূরে আরও গভীর জঙ্গলে। হিংস্র জীব জন্তুর সঙ্গে করে মোকাবেলা।

কোথায় কখন চলে যায় জ্যোতিষী নিজেও তা বুঝতে পারে না।

কোনোদিন সন্ন্যাসী বসে বসে ওর জন্য ভাবছে আজ সমস্ত দিন ওর সাক্ষাৎ নেই, না জানি কোথায় গেলো ও। হুমায়রা তো অশ্রু ছল ছল নয়নে এসে সন্ন্যাসীর পাশে দাঁড়ায়, বলে বাবা ও এলোনা কেনো?

সন্ন্যাসী তখন চট করে জবাব দিতে পারেনা। বলে–আর কিছু সময় অপেক্ষা করবো তারপর আমি গণনা করে দেখবো সে কোথায়? হয়তো গণনা করবার পূর্বেই এসে হাজির হয় ইন্দ্র, নয় গণনা করে দেখে ইন্দ্র তার সীমানা ছাড়িয়ে চলে গেছে বহুদূরে। হয়তো বুঝতে পারে কোনো ভয়ংকর জন্তুর কবলে পড়েছে নয় কোনো পর্বতে বা জঙ্গলে বিচরণ করে ফিরছে।

সন্ন্যাসী তার উদ্দেশ্য সফল আশায় ক্রমে উন্মত্ত হয়ে উঠে। ইন্দ্রনাথকে নিয়েই যে জম্বুর পর্বতের তলদেশের সেই মহামূল্যবান সামগ্রী সাত মানিক-সম বস্তুটি উদ্ধার করার চেষ্টা চালাবে কিন্তু ইন্দ্রনাথকে কিছুতেই বাধ্য করতে পারে না সে। সন্ন্যাসী জ্যোতিষী জানে সে বস্তুটি এখন জম্বুর পর্বতের তুলদেশে নেই এখন সেটা কোন নারীর হতে গিয়ে পৌঁছেছে।

কিন্তু কে সে নারী কি তার পরিচয় জানেনা জ্যোতিষী। ইন্দ্রনাথকে নিয়ে সে বহু জায়গায় ঘুরেছে, গণনায় বার বার এসে যায় রায়হান নগরে দক্ষিণ–পূর্ব অঞ্চলে কোথাও রয়েছে সেই মহামূল্যবান সম্পদটি।

জ্যোতিষীর মন মাঝে মাঝে ভীষণ খারাপ হয়ে যায়, ইন্দ্রনাথকে নিয়ে তার অনেক ভরসা। ওর নিজস্ব অস্তিত্ব লুপ্ত করে নতুন মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলো দেবনাথ।

কিন্তু ইন্দ্রকে বাগানো সম্ভব হচ্ছে না।

সেদিন ইন্দ্র ফিরে এলে বললো সন্নাসী জ্যোতিষী–ইন্দ্র, তোমাকে নিয়ে আমার বড় আশা তুমি সেই মহামূল্য সম্পদ উদ্ধার করে আনবে।

হাসলো ইন্দ্র, কোনো জবাব সে দিলোনা।

এখানে আসার পর ইন্দ্রনাথ নামী জাভেদ তেমন কোনো কথাই বলেনা, শুধু সে মাথা নেড়ে বা মাথা দুলিয়ে জবাব দেয়। নইলে একটু হাসে মাত্র।

হুমায়রার সঙ্গেও কথা বলে কম।

তবে ওর সঙ্গে কিছুটা বলে।

ক্ষুধা পেলে গো গ্রাসে খায়। কাঁচা মাংস খেতে আজ তার দ্বিধা নেই। বরং কাঁচা মাংস খেতে সে ভালবাসে। প্রতিদিন হরিণ শিকার করা তার নেশা।

ইন্দ্রনাথ তীরধনু ছুঁড়তে অভিজ্ঞ।

তীরধনু নিয়েই সে শিকারে বের হয়। হুমায়রা সঙ্গে থাকে কখনও, কখনও, সে একা বের হয়।

সন্ন্যাসী জ্যোতিষী খুশি হয় আর তাকে খাবারের সন্ধানে কষ্ট করতে হয়না।

শুধু হরিণ শিকার করাই ইন্দ্রের নেশা নয় সে যে কোনো জীব জন্তু পেলে হত্যা করে আবার কখনও কখনও হিংস্র জন্তু পেলে সে বধ করতো না। বন্দী করে নিয়ে খেলা করতো ছোট্ট শিশুর মত।

প্রকান্ড প্রকান্ড সিংহের সঙ্গেও সে লড়াই করতে মনের আনন্দে। দেহ ক্ষত বিক্ষত হতো তবু সে ক্লান্ত হতো না, যতক্ষণ সিংহটি না কাহিল হয় ততক্ষণ চলতো তার লড়াই।

লড়াই শেষে যখন ইন্দ্র ফিরে আসতে কুঠিরে তখন হুমায়রা তার সেবা করতো, রক্ত মুছে ঔষধ লাগিয়ে দিতো।

সন্ন্যাসীর ঔষধ বড় ভাল।

কাজেই ঔষধ একবার ক্ষতগুলিতে লাগালেই দ্বিতীয় বার লাগাতে হয়না, ক্ষত আরোগ্য হয়। হুমায়রা কিন্তু খুব চিন্তিত হতো, বলতো–ইন্দ্র তোমার কি এতটুকু কষ্ট হয় না?

কোনো জবাব দিতোনা ইন্দ্র।

বললো হুমায়রা–তোমার কি বোধ শক্তি নেই?

তারও কোনো জবাব দিতোনা ইন্দ্রনাথ।

হয়তো একটু হেসে মুখ ফিরিয়ে নিতো।

সন্ন্যাসী দূর থেকে সব লক্ষ্য করতো, সে চেয়েছে হুমায়রার সঙ্গে ইন্দ্রের ভালবাসা গড়ে উঠে এবং মায়ার বন্ধনে যেন ওরা আবদ্ধ হয়।

জ্যোতিষী কিছুতেই সান্ত্বনা পায়না। হুমায়রা আর ইন্দ্রের মধ্যে কোথায় যেন ফাঁক রয়েছে। ওরা আজও ঘনিষ্ঠ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারলোনা। যদিও ওদের মধ্যে মিলামিশার অভাব নেই তবু ইন্দ্র সর্বদা উদাসীন।

হুমায়রা আর ইন্দ্রকে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ করলে আর কোনোদিন ইন্দ্র চলে যাবে না এটাই হলো সন্ন্যাসীর মূল উদ্দেশ্য।

ইন্দ্র যে সাধারণ যুবক নয়, তার মধ্যে বিরাট একটি শক্তি যা কারও মধ্যে পরিলক্ষিত হয় না।

সন্ন্যাসী জ্যোতিষী একদিন ইন্দ্রনাথ সহ বেরিয়ে পড়লো। জম্মুর পর্বতের গুহায় গুহায় সন্ধান করে ফিরতে লাগলো। সে গণনা করে বুঝতে পেরেছে জম্মুর

পর্বতের কোনো গোপন গুহায় সেই মহামূল্য সম্পদটি ছিলল। সেই গুহার সন্ধান করে ফিরতে লাগলো সন্ন্যাসী।

জম্বুর পর্বতের পাদমূল দিয়ে প্রবাহিত ছিলো নীলনদের বৃহৎ শাখা হীম সাগর।

সন্ন্যাসী সমস্ত পর্বত চষে এক সময় হীম সাগর যে দিক দিয়ে প্রবাহিত ছিলো সেই ধারে এসে পৌঁছলো।

ইন্দ্রনাথ নীরবে তাকে অনুসরণ করে চলেছে। সুন্দর বলিষ্ঠ মুখমন্ডল রক্তাভ বর্ণ ধারণ করেছে। ললাট বেয়ে দরদর করে ঘাম ঝরছে।

তবু তার মধ্যে নেই ক্লান্তির ছাপ।

সন্ন্যাসী মাঝে মাঝে তাকিয়ে দেখে নিচ্ছিলো ইন্দ্রনাথকে। ওর দিকে তাকালে সন্ন্যাসী জ্যোতিষীর মন তৃপ্ত হয়ে উঠতো। এমনি এক তরুণের সন্ধান সে এতদিন করে এসেছে যাকে দিয়ে অসাধ্য সাধন করানো সম্ভব হবে।

বিরাট পর্বতমালার বিভিন্ন দিকে, উচ্চ স্তরে স্তরে এবং পর্বত গহ্বরে সন্ধান করে ফিরছে সন্ন্যাসী, কোথায় ছিলো সম্পদ।

হঠাৎ সাগর ধারে একটি গুহার আবিষ্কার করলো সন্ন্যাসী, কিন্তু গুহা মুখে বিরাট একটি পাথর খন্ড মুখ বন্ধ করে রেখেছে।

সন্ন্যাসীর সন্দেহ হলো সে ঐ–মুহূর্তে গণনায় বসলো। গণনা করে জানাতে পারলো এই সেই গুহা, কিন্তু এ গুহায় সে মহামূল্য সম্পদ নেই।

সন্ন্যাসী তবু জানতে চায়, দেখতে চায় ঐ গুহা মধ্যে কেমন এবং কোথায় ছিলো সেই বস্তুটি।

সন্ন্যাসী ইন্দ্রনাথকে বললো–বৎস, ঐ পাথরখানা সরিয়ে ফেলে।

ইন্দ্রনাথ সন্ন্যাসীর কথামত ঐ পাথর সরিয়ে ফেলার চেষ্টা করতে লাগলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই পাথর খন্ডটি সরিয়ে ফেললো সে। সন্ন্যাসী জয়ধ্বনি করে উঠলো তারপর পিঠ চাপড়ে দিলো সে ইন্দ্রনাথের।

এবারে সন্ন্যাসী ইন্দ্রনাথসহ গুহায় প্রবেশ করলো। গুহায় প্রবেশ করতেই সন্ন্যাসী চমকে উঠলো।

ইন্দ্রনাথ তার পিছনে।

দেখলো সন্ন্যাসী–বিরাট আকার একটি নরকংকাল হেলান দিয়ে বসে আছে গুহার দেয়ালে ঠেস দিয়ে।

সন্ন্যাসী ভীত হলেও তা প্রকাশ করলো না নিজের মুখ ভাবে। ইন্দ্রনাথকে লক্ষ্য করে বললো সন্ন্যাসী–দেখো ইন্দ্র এই যে নর কংকাল দেখছো এটা দশ হাজার বছর পূর্বের। তখন মানুষের আকার ছিলো বৃহৎ। তারা ছিলো বিশাল শক্তিশালী। এই নর কংকাল দীর্ঘ দিনেও বিনষ্ট হয়নি।

ইন্দ্রনাথ নীরবে তাকিয়ে দেখতে লাগলো, কোনো কথা সে বললো না।

সন্ন্যাসী বললো–এই নরকংকাল যে ব্যক্তিদের সে এক মহাপুরুষ ছিলো, তারই ছিলো ঐ মহামূল্যবান সাত মানিক–সম সম্পদটি। এই গুহাই ছিলো তার বাসস্থান। সম্পদটিও তার কাছে ছিলো; মৃত্যুর পর সেই সম্পদ কোনো ক্রমে সাগরের মধ্য হতে কোনো জীব উঠে আসে এই গুহায় এবং গিলে ফেলে। সেই সম্পদটি চলে যায় এক সময় এক জংলী সর্দারের হাতে। তারপর এখন সেই সম্পদ কোনো নারীর হাতে... কথাটা শেষ না করেই হঠাৎ বলে উঠলো–ঐ দেখ ইন্দ্রনাথ। ঐ যে বিরাট আকার একটি গর্ত গুহার তলদেশে দেখা যাচ্ছে ঐ গর্ত দিয়ে সাগর হতে কোনো জীব এসে সেই মহামূল্যবান সম্পদটি গিলে ফেলেছিলো। আমার গণনা সত্য, আমি জয়ী হবো, যেমন করে হোক খুঁজে বের করবো সেই নারীকে যে নারীর হাতে এসে পৌঁছেছে সাত মাণিক সম মূল্যবান বস্তুটি। এস ইন্দ্রনাথ, আমার গণনায় কোনো ভুল নেই

সন্ন্যাসী ইন্দ্রনাথসহ ফিরে এলো তার কুঠিরে।

হুমায়রার দুচোখে দুশ্চিন্তার ছাপ ফুটে উঠেছিলো। সন্ন্যাসী বাবার জন্যও ভাবছিলো সে, আর ভাবছিলো ইন্দ্রনাথের জন্য। ইন্দ্রনাথ তার প্রিয় জন, ওকে সে আপন করে নিয়েছে সমস্ত অন্তর দিয়ে।

ইন্দ্রনাথ এসে পৌঁছতেই হুমায়রা এসে তার কণ্ঠ বেষ্টন করে ধরলল–ইন্দ্র, তুমি ফিরে এসেছ। সত্যি আমার কি যে আনন্দ লাগছে

এমন সময় সন্ন্যাসী প্রবেশ করে উঠানে।

হুমায়রা ইন্দ্রনাথের কণ্ঠ ত্যাগ করে সরে দাঁড়ালো বললো–বাবা তোমরা আজ কদিন ছিলেনা আমার বড় ভয় করতে। এসেছে বাচলাম।

সন্ন্যাসী হেসে বলে–এলাম তো বটে কিন্তু কাজ তো এখনও সমাধান হলো না।

হুমায়রা বলে–হবে বাবা, হবে, ধৈর্য্য ধরো। সব হবে, সব পাবে …

সত্যি মা তোর কথা যেন সত্য হয়। জানিস মা হুমায়রা, ইন্দ্রনাথ আমার অসাধ্য সাধন। করেছে।

কি করেছে বাবা?

বস বস বলছি…সন্ন্যাসী বাবা সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করে।

অবাক হয়ে শোনে হুমায়রা। ইন্দ্রনাথের কার্যকলাপ এর বর্ণনা শুনে আরও বিমুগ্ধ হয় সে।

অদূরে দন্ডায়মান ইন্দ্রনাথের দিকে তাকায় হুমায়রা বিস্ময় ভরা দৃষ্টি নিয়ে।

*

সর্দার, আপনার কথামত আমরা আমাদের অনুচরগণকে শ্রমিকের ছদ্মবেশে দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়েছিলাম। তারা বেশ কিছু সন্ধান এনেছে।

কি সন্ধান এনেছে তারা?

সর্দার, আপনি অনেক দিন দেশে ছিলেন না। এ কারণে দেশের মধ্যে নানা ধরণের অসৎ ব্যক্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে।

আমি তা অনুধাবন করেছি রহমান।

সর্দার, সরকার দেশবাসীর উন্নতি কল্পে–নানা ধরনের প্রকল্প হাতে নিয়েছে। সরকার চান দেশবাসীরা মানুষের মত বাচুক কিন্তু…..

কথা শেষ না হতেই বলে উঠে বনহুর–কিন্তু দেশবাসী বাচুক তা সবাই চায় না। তারা চায় নিজেরা বাঁচতে এবং আর সবাইকে নিষ্পেষিত–করে তাদের মেরুদন্ড ভেঙে দিতে।

সর্দার ঠিক বলেছেন দেশের অবস্থা এখন তাই। এক শ্রেণীর লোক আছে যারা চিরদিন অসহায়দের শোষণ করে আসছে

এই এক কথা বার বার বলতে বা শুনতে ইচ্ছা হয় না।

সর্দার এরা চিরকাল থাকবে এবং আছে। নিষ্পেষণ আর শোষণ ছাড়া তারা নিজেরা বাঁচতে পারে না। দেশ থেকে যদি এই শ্রেণীর মানুষগুলোকে বেছে বের করা যেত…

বেছে বের করা নয় খতম করা যেত। তা হলে হয়ত দেশ কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতো।

তা কোনো দিন সম্ভব হবে না সর্দার। যেমন বাংলার নবাব সিরাজদ্দৌলা বার বার জন্মগ্রহণ করছে তেমনি মিরজাফরও জন্মাচ্ছে….কোন দিন কেউ কি পেরেছে–এই জন্মকে নির্মূল করতে। সর্দার যদি মিরজাফরের দল জন্মগ্রহণ না করতো তা হলে এ বিশ্ব আজ বেহেস্তে পরিণত হতো….

রহমান তোমার কথাগুলো সত্য তাই বলে মিরজাফরের দলকে তুমি প্রশ্রয় দিয়ে যাবে? না তা হবে না, যাতে তারা বাড়তে না পারে সে চেষ্টা করতে হবে।

নির্মূল করা যাবে না সর্দার। গম্ভীর কণ্ঠে বললো রহমান।

বনহুর পায়চারী করছিলো, বললো–রহমান নির্মূল হয়তো করা যাবে না। কিন্তু সায়েস্তা করা যাবে। যেমন মিরজাফরকে গ্রহণ করতে হয়েছিলো তার কর্মের উপযুক্ত পুরস্কার।

সর্দার গদিতে বসে আজ যারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন তাদের মধ্যেই চলেছে যত সব অসৎ কর্ম। আপনি যাদের সায়েস্তা করেছিলেন, যারা বন্দী হয়ে ছিলো তারা সবাই আজ মুক্ত…

মানে?

সর্দার, স্বনামধন্য জনাব আরফিন আলী বিনা বিচারে জেল থেকে মুক্তি লাভ করে আবার গদিতে বসেছেন। শুধু গদিতে তিনি সুখী হননি–মহাত্মন সরকার বাহাদুরের পরম হিতাকাক্ষী সেজে নগর ছেড়ে পল্লীর দুয়ারে পল্লীবাসীদের কিসে সুখ শান্তি ফিরে আসবে তারই গুণগান গেয়ে বেড়াচ্ছেন। এসব স্বনাম ধন্য ব্যক্তিরাই একদিন শত শত ব্যক্তির জীবন নাশ করতে দ্বিধা বোধ করেননি, এখন তারা সাধুতার মুখোস পরে মহাত্মা হয়েছেন।

তুমি জানোনা রহমান এরা দেশের কত বড় বিষকীঠ। একটু থেমে বললো বনহুর–কান্দাই সরকার চান দেশ ও দেশ বাসীকে জীবিত রাখতে। তারা যেন ক্ষুধা পিপাসায় মৃত্যুবরণ না করে। দেশের জনগণ যেন শিক্ষা লাভ করে মানুষের মত বাঁচতে পারে। সরকারের ইচ্ছাকে আমি অভিনন্দন জানাই। কিন্তু সরকারের চার পাশ ঘিরে যারা বিচরণ করছে। তারা হলেন বড় স্বার্থপর, অর্থ আর গদির জন্য তারা অন্ধ....জানো রহমান এরা কত বড় অপদার্থ–সরকারের অর্থ জঘন্য উপায়ে আত্মসাৎ করে নিজেরা সানসৌকত ভাবে দিন যাপন করছে....দেশের উপকারের চেয়ে। অপকার করছে তারা বেশি। একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে পুনরায় বলে বনহুর–সরকারের অর্থ মানেই জনগণের অর্থ। এ অর্থ এভাবে অপচয় করা মানে জনগণকে নিঃশেষ করা।

সর্দার–সরকার চান এসব স্বনামধন্য ব্যক্তিদের দ্বারা দেশকে আদর্শ দেশ হিসাবে গড়ে তুলবেন কিন্তু এরা পদ আর অর্থের লালসায় এক একজন নরপশু বনে গেছে....

সবাই নয় রহমান; এদের মধ্যেও মহৎ ব্যক্তি আছেন যারা সত্যিই দেশের মঙ্গল কামনা করেন।

সর্দার।

বলো রহমান?

আমি জানি সর্দার যারা দেশ ও দেশের জনগণের মঙ্গল কামনা করেন তারা কারা। তাদেরকে আমরা সালাম জানাই। তবে কিছু সংখ্যক আছেন যারা ক্ষমতার অপব্যবহার করে চলেছেন। অহেতুক হয়রানি করছেন জনগণকে, এমনকি বিনা কারণে বিনা দোষে নিজস্ব স্বার্থসিদ্ধি চরিতার্থে জেল হাজতেও প্ররণ করতে পিছ পা হচ্ছেনা।

রহমান–এ কথা মিথ্যা নয়, পূর্বে পারিবারিক আক্রোশ ছিলো যার প্রতি তাকে নাজেহাল পেরেশান করে ছাড়ে ওরা। শুধু তাই নয় ইচ্ছা খেয়াল খুশি চালিয়ে চলেছেন। একটু থেমে দাঁতে দাঁত পিষে বললো বনহু–এরা এখন আপনাতে আপনি বিভোর। মনে করেছে চিরদিন ওরা গদি দখল করে বসে থাকবে। গতি চ্যুত হলেই তাদের অবস্থা কি হবে এ কী ওরা একবারও খেয়াল করে না..

সর্দার জনগণ এখন নীরবে সব সহ্য করছে। হজম করবার চেষ্টা করছে এই অহেতুক নির্যাতন। কিন্তু একদিন এদের বিস্ফোরণ ঘটবে।

সেদিন আর বেশি দূরে নেই রহমান।

সর্দার আজ আমরা হামলা চালাবো। জনাব আরফিন আলীর গোপন গুদামে। যেখানে তার হাজার হাজার মন খাদ্যশস্য মজুত আছে।

শুধু তাই নয়; আরফিন আলীকে তুলে নিয়ে আসবে–তাকে কিছুটা শায়েস্তা করতে হবে। আজ মহাত্মন আরফিন আলী তার গুদামে যাবেন

সর্দার আপনি..

হাঁ আমি সব খবর জানি রহমান। আজ রাত ভোর হবার পূর্বে তার গুদাম থেকে মাল চলে যাবে, দুখানা জাহাজ অপেক্ষা করছে কান্দাই বন্দরে।

সর্দার।

রহমান আরও জেনে রাখো তোমরা যদি ঠিক সময় মত পৌঁছতে না পারে তা হলে সমস্ত প্রচেষ্টা তোমাদের বিফল হবে।

আমরা ঠিক সময় মতই হাজির হবো।

এমন সময় নূরী এসে দাঁড়ালো বনহুরের পাশে। মুখমন্ডল মলিন বিষণ্ণ, চোখ দুটো তার অশ্রুসিক্ত। বনহুর তাকালো নূরীর মুখের দিকে।

নূরী বলে উঠলো–তুমি এতো হৃদয়হীন তা জানতাম না। নিজ সন্তানের জন্য তোমার এতোটুকু মায়া মমতা নেই।

বনহুর কোনো জবাব দিলো না।

রহমান দাঁড়িয়ে রইলো একপাশে মাথা নীচু করে।

নূরী বলে চলেছে–জাভেদ অসুস্থ অবস্থায় চলে গেলো, কোথায় গেলো একটি বার তার সন্ধান নিলেনা? পাষন্ড ওর জন্য কি তোমার মন এততটুকু ব্যথাকাতর হয়না?

না, আমি একটুও ভাবিনা ওর জন্য। নূরী, তোমার ছেলে কচি খোকা নয়, সে হারিয়ে যাবে না।

নূরী আঁচলে চোখের পানি মুছতে মুছতে বেরিয়ে গেলো।

রহমান তাকালো বনহুরের মুখের দিকে।

গম্ভীর কণ্ঠে বললো বনহুর–রহমান, কায়েস ফিরে এসেছে?

না সে এখনও দলবল নিয়ে ফিরে আসেনি। মংলু তার দলবল নিয়ে ফিরে এসেছে সর্দার। তারা সমস্ত কান্দাই জঙ্গল এবং পর্বতমালা তন্ন তন্ন করে খুঁজেছে কিন্তু কোথাও সন্ধান পায়নি জাভেদের।

চিন্তিত কণ্ঠে বললো বনহুর–গেলো কোথায় সে?

আমি নিজেও বহু সন্ধান করেছি সর্দার–কিন্তু..

কোথাও তাকে পাওয়া যায়নি। জানিনা সে কোথায় গেছে কেমন আছে....সর্দার, তাকে আমি খুঁজে বের করবোই। আমাকে কিছু দিনের জন্য ছুটি দিন।

দেবো–কিন্তু আজই নয়, কাজ শেষ হলে তুমি তার সন্ধানে বের হবে।

বড় বিলম্ব হবে সর্দার।

হতে দাও! গম্ভীর কঠিন কণ্ঠে বললো বনহুর।

রহমান কোনো জবাব দিলো না।

এমন সময় কায়েস তার সঙ্গীদের নিয়ে আস্তানায় প্রবেশ করলো। তাদের চোখে মুখে ক্লান্তির ছাপ বিদ্যমান।

নূরী উন্মাদিনীর মত ছুটে গেলোকায়েস ভাই, তুমি জাভেদের সন্ধান পেলে।

কায়েস কোন জবাব দিতে পারলো না।

সঙ্গীদের একজন বললো–বড় আফসোস্ নূরী বোন, জাভেদকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেলো না। আমরা কান্দাইয়ের কোনো জায়গা বাদ নেই নি।

সমস্ত কান্দাই তোমরা খুঁজেছো?

হাঁ! হাঁ বোন।

নূরী দুহাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা তাকে দাহ করে চলেছে। জানি না আজ কোথায় জাভেদ, কেমন আছে সে, ভাবতে থাকে নূরী।

নাসরিন আর ফুল্লরা তারাও অশ্রু ফেলতে থাকে। সান্ত্বনা দেয়ার ভাষা খুঁজে পায় না।

নূর ধীরে ধীরে মায়ের ঘরে প্রবেশ করে। আজ দুদিন হলো অসুখের ভান করে সে রয়ে গেছে চৌধুরী বাড়িতে। সে জানে মায়ের ঘরে তার আব্বু আসতো, তার কণ্ঠস্বর সে শুনেছে অনেক গভীর রাতে। নিশ্চয়ই ঐ কক্ষে কোনো সুড়ঙ্গ পথ আছে যে পথে তার আব্বু মায়ের ঘরে এসেছে। একটা বিরাট জানার বাসনা তাকে উন্মুখ করে তুলেছে।

মনিরা অঘোরে ঘুমাচ্ছে।

তার শিয়রে ডিম লাইট– স্বল্প আলো দিচ্ছে। সেই স্বল্প আলোতে মনিরার ঘুমন্ত মুখ খানাকে অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছিলো।

নূর একবার তাকিয়ে দেখে নিলো মায়ের মুখ খানা। নীরবে ঘুমাচ্ছে মনিরা।

অনুসন্ধান করে চলেছে নূর।

তার হাতের মুঠায় রয়েছে ক্ষুদে টেষ্ট মেশিন। নূর নিচু হয়ে টেষ্ট মেশিন দিয়ে মেঝে পরীক্ষা করে দেখছিলো। হঠাৎ তার মুখ মন্ডল দীপ্ত হয়ে উঠলো। টেষ্ট মেশিনে সুড়ঙ্গ পথের সন্ধান মিললো।

নূর এবার একটি আগলা ধরণের চাপ লক্ষ্য করলো, চাপটা সরিয়ে ফেলার চেষ্টা করতেই সরে গেলো মেঝের সেই অংশটুকু। একটি সুড়ঙ্গ পথ নজরে পড়লো। নূর আবার তাকালো ঘুমন্ত মায়ের মুখের দিকে।

নীরব নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে মনিরা।

নুর সুড়ঙ্গ মধ্যে নেমে গেলো। সুন্দর সুড়ঙ্গপথ, নুর দ্রুত এগিয়ে চললো।

সুড়ঙ্গ মধ্যে প্রবেশ করে সুড়ঙ্গ মুখ বন্ধ করে দিলো নূর, হঠাৎ মা জেগে উঠলেও যেন বুঝতে না পারে। নূর এগিয়ে যাচ্ছে ক্ষিপ্র গতিতে। আশ্চর্য হচ্ছে নূর সুড়ঙ্গ পথটির যেন শেষ নেই।

বহুক্ষণ চলার পর থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো নূর, সুড়ঙ্গ মুখ বন্ধ বলে মনে হলো তার। কিন্তু একটা কণ্ঠস্বরের অস্পষ্ট আওয়াজ ভেসে এলো তার কানে।

সুড়ঙ্গ মুখ যেখানে বন্ধ হয়ে গেছে সেখানে এসে ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়ালো। হাত বুলিয়ে দেখলো

একটি বিরাট পাথর খন্ড মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। নূর দেখলো পাথর খন্ডটির ওপাশ থেকে কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে।

ভাল ভাবে নূর পরীক্ষা করে দেখতে লাগলো। একটু ফাঁক আছে কিনা কোথাও।

হঠাৎ নূর দেখলো একটি ছিদ্র বা ফাঁক পাথর খন্ডের মধ্যে পরিলক্ষিত হচ্ছে। নূর তাড়াতাড়ি গিয়ে দাঁড়ালো সেই ছিদ্র পথের মুখে।

ও পাশে আলো জ্বলছে।

সেই আলোর ক্ষীণ রেখা ঐ ছিদ্রপথে দেখা যাচ্ছিলো, এবং এথাও ভেসে আসছিলো সেই পথে। নূর দৃষ্টি ফেললো, স্পষ্ট নজরে পড়ছিলো সবকিছু।

দেখলো ঐধারে একটি গুহা, গুহার দেয়ালে দপ্ দপ্ করে মশাল জ্বলছে।

নূর মশালের আলোতে স্পষ্ট দেখলো জমকালো পোশাক পরিহিত বলিষ্ঠ এক ব্যক্তি। তার সম্মুখে হাত দুখানা পিছমোড়া করে বাঁধা। লোকটির দেহের বসন এবং চেহারা যত টুকু দেখা যাচ্ছিলো তাতে মনে হয় ব্যক্তিটি সাধারণ নয়, কোনো মহান নেতা। কিন্তু তার এমন অবস্থা কেন?

ভালভাবে লক্ষ্য করে নূর দেখলো জমকালো পোশাক পরিহিত লোক অন্য কেউ নয় তার আব্বু। দীপ্ত সুন্দর বলিষ্ঠ মুখে দৃঢ়তার ছাপ। জমকালো পোশাকে আব্বুকে নূর এমন করে দেখলো যেমন করে সে কোনোদিন দেখেনি।

মশালের আলোতে অদ্ভুত সুন্দর লাগছে আব্বুকে। নূরের দৃষ্টি স্থির হয়ে রইলো তার আব্বুর মুখে।

হাত পিছমোড়া করে বাঁধা লোকটা রীতিমতো হাঁপাচ্ছে। সমস্ত দেহ তার ঘামে ভিজে চুপসে উঠেছে। বার বার জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে লোকটা।

লোকটাকে চিনতে চেষ্টা করে নূর। কোথাও যেন দেখেছে তাকে।

ভেসে আসে বনহুরের কণ্ঠস্বর–সরকার বাহাদুরের টাকা মানে জনগণের টাকা। কোন অধিকারে আপনি সে টাকা অপব্যবহার করছেন। কোন সাহসে সে টাকা আপনি আত্মসাৎ করে নিজের ব্যাংক ব্যালেন্স বাড়িয়েছেন জবাব দিন?

লোকটা বলে উঠে–তুমি.... তুমি আমাকে এবারের মত মাফ করে দাও। আর আমি...

জনগণের সর্বনাশ করবেন না, এই তো?

হাঁ, হাঁ আমি শপথ করছি। আমাকে আর কষ্ট দিওনা। আমাকে মুক্ত করে দাও আমি আর এমন কাজ করোনা।

আপনাদের কথা আমি বিশ্বাস করিনা। জনসভায় দাঁড়িয়ে সাউন্ড বক্সে মুখ রেখে বড় বড় বুলি আউড়িয়ে আপনারা মিথ্যে ভাষণ দিয়ে নিরীহ সরলন সহজ

মানুষদের হৃদয় জয় করে নিতে পারেন কিন্তু আমি নিরীহ জনগণ ই। আমি আপনাদের আসল রূপ চিনি।

যা চাও আমি তাই দেবো। আমার সমস্ত ধন সম্পদ তোমাকে দেবো।

থুঃ তোমার সম্পদে। অমন সম্পদ আমি ঘৃণা করি তবে হাঁ তোমাকে উপযুক্ত সাজা গ্রহণ করতে হবে এবং তোমার ধন সম্পদ সব দুঃখী জনগণের মধ্যে বিলিয়ে দেবো।

তাহলে মুক্তি পাবো তো? বললো সেই বন্দী লোকটি।

অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো বনহুর। হাসির শব্দ নূর স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে, এ হাসি যে তার অতি পরিচিত। তার প্রিয় আব্বু... বনহুর, দস্যু বনহুর। একদিন এ নাম শুনলে তার ধমনির রক্তে আগুন ধরে যেত, আর আজ সমস্ত দেহ মন শান্তিতে ভরে ওঠে। তার আব্বু...এক মহান পুরুষ, যার সঙ্গে তুলনা হয় না কারো।

নূরের মনে পড়ে যায় ছোট বেলার কথা, তার আব্বু কেমন করে তাকে আদর করতো, কেমন করে হঠাৎ হেসে উঠতে সে হাসি যেন অদ্ভুত ছিলো....এমনি কত কি এলো মেলো ভেবে চলেছে নূর হঠাৎ পিতার কণ্ঠস্বর শুনতে পায় নূর। বনহুর বলছে যাও রহমান ওকে রত্নাগারে নিয়ে যাও এবং সেখানে বন্দী করে রাখো। জনাব আরফিন আলী রত ভক্ষণ করে উদর পূর্ণ করুক।

সর্দারের আদেশ শোনা মাত্র রহমান দুজন অনুচরকে ইংগিত করলো। তারা জনাব আলীকে টেনে তুলে দাঁড় করিয়ে দিলো তারপর টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চললো।

জনাব আরফিন নামটা শোনা মাত্র নূর চমকে উঠেছে, কারণ তিনি সরকার বাহাদুরের একজন নিষ্ঠাবান কর্মী। মন্ত্রি বাহাদূর আরফিন আলী তার এ অবস্থা। মহান নেতা আলী সাহেব তা হলে বনহুর আস্তানায় বন্দী...নূর আরও মনোযোগ সহকারে কান পাতলো।

আরফিন আলী করুণ কণ্ঠে বললো–তুমি যেই হও আমাকে এবারের মত মাফ করে দাও। আমার ধনসম্পদ আমি সব বিলিয়ে দেবো। আমার বাড়ি আমি হসপিটাল বানিয়ে দেবো....

রহমান ও দুজন অনুচর তাকে টেনে নিয়ে চলেছে। তবু আলী সাহেব কথাগুলো করুণ কণ্ঠে বলে যাচ্ছে।

বনহুর বললো–আপনারা যখন বিপদে পড়েন তখন অমনি বুলি আউড়িয়েই থাকেন। যা করেছেন তার উপযুক্ত সাজা পেতেই হবে। যাও রহমান ওকে নিয়ে যাও, বিলম্ব করোনা।

আরফিন আলীকে নিয়ে চলে যায় রহমান ও তার সঙ্গীদ্বয়।

নূর আর মুহূর্ত বিলম্ব না করে ফিরে চলে। তার মায়ের কক্ষ থেকে বনহুরের দরবার কক্ষ পর্যন্ত এই সুড়ঙ্গ পথ, এবার বুঝতে পারে নূর।

*

আজ দুদিন হলো নূর অসুস্থ অবস্থায় চৌধুরী বাড়িতে এসেছে। তার অসুখ ভীষণ মাথা ব্যথা এবং তার সঙ্গে পেট ব্যথা। নিজের ঘরে সে শয়ন না করে মায়ের ঘরে অপর এক বিছানায় শুয়ে ছিলো সে। কিন্তু সকাল বেলা কাউকে কিছু না বলে সে গেলো কোথায়।

নূর খামখেয়ালী বটে–তাই বলে একেবারে এমন খেয়ালী তা তো জানতো না মনিরা। এমনকি বৃদ্ধা দাদীমাকেও সে কিছু না বলে চলে গেলো।

বেলা যত বাড়ছে–ততই চিন্তা বাড়ছে মনিরার।

নূরের বাংলোয় টেলিফোন করেও কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। বাংলোর বয় বলেছে সাহেব তো বাসায় আসেননি।

মনিরাই শুধু নয় মরিয়ম বেগম এবং সরকার সাহেব এনারাও ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। না জানিয়ে সে কোথায় গেলো, দরজা খোলা ছিলো।

নূর সুড়ঙ্গ পথে প্রবেশের সময় দরজা খুলে ভেজিয়ে রেখেছিলো, হঠাৎ মা যদি জেগে উঠে তাহলে তার শূন্য বিছানা দেখে যেন মনে করে সে বাইরে গেছে। বুদ্ধিমান নূর মাকে জানতে দিতে চায় না সে কোথায় গেছে।

সমস্ত দিন কেটে গেলো।

নূরের কোনো সন্ধান পাওয়া গেলো না।

নূর অসুস্থ, এ কারণে মনিরা ও দাদীমার বেশি চিন্তা।

বেলা গড়িয়ে এলো।

বেলকনির ধারে দাঁড়িয়ে মনিরা পথের দিকে তাকিয়ে ছিলো। এমন সময় কেউ পিছন থেকে তার চোখ দুটো ধরে ফেললো।

মনিরা চমকে উঠলো, বললো–কে? কে তুমি?

চোখ থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে গবেষ্টন করে হাসিতে ফেটে পড়লো নূর।

মনিরা আনন্দ মিশ্রিত ক্রুদ্ধ ভাব নিয়ে বলে উঠে–নূর, আমাকে এ ভাবে ভাবিয়ে তুলেছিলি কেন বলতো?

বড় ঘাবড়ে গিয়েছিলে, তাই না আম্মু

সত্যি কোথায় গিয়েছিলি বলতো?

তোমাকে না বলে এমন এক জায়গায় গিয়েছিলাম আম্মু যেখানে সহজে কারো যাওয়া সম্ভব নয়।

মনিরা এতক্ষণ নূরকে ভালভাবে লক্ষ্য করেনি তার পা থেকে মাথা অবধি লক্ষ্য করে বলে উঠলো–একি, এমনভাবে ঘেমে নেয় উঠেছিস্ কেন নূর?

হেসে বললো–নূর বললাম তো আম্মু এমন এক জায়গায় গিয়েছিলাম যেখানে সহজে কেউ যেতে পারে না। এর বেশি কিছু জানতে চেওনা লক্ষ্মী আম্মু। চলো দাদীমার কাছে যাই। নূর মনিরা সহ দাদীমার কক্ষের দিকে এগিয়ে চললো।

মরিয়ম বেগম নূরকে পেয়ে বুকে টেনে নিলেন। মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন—-এমন করে না বলে যেতে হয়? কি যে ভাবিয়ে তুলেছিলি নূর কি বলবো।

এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠে।

নূর রিসিভার তুলে নেয় হাতে, ওপাশ থেকে ভেসে আসে পুলিশ প্রধানের কণ্ঠস্বর….মিঃ জামান, সর্বনাশ হয়েছে গত রাতে মিঃ আরফিন আলী সাহেব তার বাসভন থেকে নিখোঁজ হয়েছেন…. তাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না….আপনি…..সুস্থ হয়ে থাকলে শীঘ্র চলে আসুন।

নূরের ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠলো, বললো….এখন আমি সুস্থ….আসছি,

রিসিভার রেখে বললো নূর–আম্মু, এবার আমাকে যেতে হবে, পুলিশ অফিস থেকে ডাক এসেছে।

[পরবর্তী বই নর কঙ্কাল]

পূর্ববর্তী:

« ৭.০৯ রূপালী সূর্য

পরবর্তী:

৭.১১ নর কঙ্কাল »